গণমাধ্যম ভাবনা

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে গত প্রায় দুই দশকে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সাপ্তাহিক পত্রিকার চাহিদা কমেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোর কলেবর বেড়েছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বেড়েছে বহুগুণ। আগের চেয়ে সাংবাদিকতা শেখার প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানসহ নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা এ পেশায় আসছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে সম্প্রচার সাংবাদিকতায়। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশনকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ২০০০ সালে একুশে টেলিভিশন চালুর মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হয় সত্যিকারের সম্প্রচার সাংবাদিকতা। সময় গড়িয়ে এখন দেশে দুই ডজন স্যাটেলাইট চ্যানেল, অর্ধডজন এফএম রেডিও আর অনেক অনেক পত্রিকা, সাময়িকী ও অনলাইন। সাংবাদিকের সংখ্যাও বেড়েছে সমান হারে। কিন্তু সেভাবে কি বেড়েছে সাংবাদিকতার মান? নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা বড় ঝড় তুলছে সমাজে। কিন্তু কোথাও কোথাও যা করা দরকার, তা হয়তো হচ্ছে না। গত প্রায় দুই যুগের অধিককাল ধরে কাগজ ও ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায় সংশ্লিষ্ট থেকে গণমাধ্যমকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। সেই দেখা ও অভিজ্ঞতাই তিনি তুলে এনেছেন এই বইয়ে। তাঁর ভাষা আশ্চর্য রকম সহজ, বিষয় বিচিত্র কিন্তু বিশ্লেষণ অত্যন্ত গভীর। পাঠক তাঁর সাথে সব বিষয়ে একমত না হলেও পাবেন চিন্তা করার খোরাক আর পাবেন সময়োচিত অনেক তথ্য ও বিশ্লেষণ। কেবল মিডিয়াসংশ্লিষ্টরাই নন, যাঁরা গণমাধ্যম নিয়ে ভাবেন এবং এর গতিপ্রকৃতি বুঝতে চান, তাঁদের জন্যও অত্যন্ত সুখপাঠ্য একটি বই।

প্রচ্ছদ। মাহবুবুল হক

www.pathagar.com

গণমাধ্যম ভাবনা

www.pathagar.com

গণমাধ্যম ভাবনা

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

কথাপ্রকাশ

www.pathagar.com

© লেখক

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রচ্ছদ : মাহবুবুল হক

প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
প্রকাশনা উপদেষ্টা : সৈকত হাবিব

প্রধান কার্যালয় : ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (তৃতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১৭৫০৯৫, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪

শাহবাগ কার্যালয় : ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (তৃতীয় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৬৫০৯১৯, ০১৯১২৬০৩৪৬১

বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১৭২৪২৫, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১২৪৬৫৩, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

মূল্য : ১০০.০০

Gonomadhyam Vabna by Syed Ishtiaque Reza, Published by Mohd. Jashim Uddin, Katha Prokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 7175095, 7170614. First Published : February 2013. Price : Tk. 100.00.
Email : katha@professorsbd.com, Web : www.professorsbd.com

ISBN : 984-70120-0311-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মেঝোভাই
সৈয়দ মোস্তফা কামাল
এমন সরলপ্রাণ ভালো মানুষ খুব কম দেখেছি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সাংবাদিকতা করি। রিপোর্টিং করেছি। এখন করতে হয় সম্পাদনা। কত ধরনের রিপোর্ট প্রতিদিন প্রচার হয় আমার হাত ধরে। কত মানুষের বিপক্ষে যায়। কত মানুষের পক্ষে যায়। কোনো হিসাব কি আমরা রাখতে পারি? আসলে তা সম্ভবও নয়। সাংবাদিকতা মানুষের জন্য। সাংবাদিকরা যা কিছু লেখেন-বলেন, মানুষের জন্যই। এই যে মানুষ, তাদের মধ্যে আছে অনেক দূরের মানুষ, অনেক কাছের, অনেক প্রিয় মানুষ। কিন্তু সবার কাছ থেকে সাংবাদিকের অবস্থান স্বতন্ত্র। এই বাস্তবতায় মানুষের জন্য আমরা যা কিছু করি, তা কতটা যৌক্তিকতার সাথে করি, কতটা ন্যায্যতার সাথে করি, তা ভাবায় আমাকে। একই সাথে ভাবায় গণমাধ্যমের সামাজিক অবস্থান, গণমাধ্যমে বিরাজমান পরিস্থিতি। ভাবায়, সাংবাদিকদের কর্মকাণ্ড, ভালো-মন্দ সবই। আর এই ভাবনা থেকেই লেখা শুরু। প্রথমে তাৎক্ষণিক আবেগ ও চিন্তায় দু-একটি রচনা। তারপর সহকর্মীদের বলাবলিতে আরো লেখা। এসব লেখায় যাদের উৎসাহের কথা বলতেই হয়, তাঁদের একজন টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব খ ম হারুন, যিনি প্রতিটি লেখা পড়ে মতামত দিয়েছেন। তার সাথে বন্ধু শাকুর মজিদ। সহকর্মী ইকরাম কবীরের কথা না বললেই নয়, যিনি সবসময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আর যাদের কারণে এসব লেখা মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের মধ্যে অনলাইন বার্তা সংস্থা বাংলানিউজ-এর বার্তা সম্পাদক মাহমুদ মেনন এবং নতুনবার্তার সম্পাদক সরদার ফরিদ আহমদ (যিনি এর আগে সম্পাদনা করেছেন বার্তা২৪-এর)। এই বইটি আলোর মুখ দেখেছে কথাপ্রকাশ-এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের আন্তরিকতায়। আর প্রকাশনার সব জটিলতার দায়িত্ব নিয়েছেন কবি ও সাংবাদিক সৈকত হাবিব। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারি ২০১৩

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
বার্তা পরিচালক, একাত্তর টিভি

www.pathagar.com

সূচি

আগামীর বাংলাদেশে গণমাধ্যমই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠান	৯
একঘেয়ে অবস্থার অবসান ঘটাতে আসবে কি নতুন দিনের সাংবাদিকতা?	১১
কোলাবোরেটিভ জার্নালিজম	১৪
সাংবাদিকের একমাত্র নিয়ন্ত্রক তার মূল্যবোধ	১৬
রিপোর্টিং অত্যাবশ্যকীয়	১৮
সন্ত্রাসী আর পুলিশের সাধারণ টার্গেট কি সাংবাদিকরা?	২১
গণমাধ্যম কি থাকছে?	২৪
আতাউস সামাদ, মনেপ্রাণে একজন রিপোর্টার	২৭
মাননীয় অর্থমন্ত্রী, একটু ভেবে বলুন	২৯
ক্ষুদ্রের সাধনা দিয়ে কি বড় কিছু হয়?	৩১
কোন পথে হাঁটবো আমরা?	৩৩
সাম্প্রতিক সময়ের টেলিভিশন রিপোর্টিং: কিছু প্রশ্ন	৩৫
সামাজিক মাধ্যম, যা দেখবো আগামীতে	৩৮
নিউ মিডিয়া, প্রচলিত মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক	৪০
ডার্ক জার্নালিজম	৪২
গুড জার্নালিজম	৪৫
মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও এর প্রতিক্রিয়া	৪৭
মহানগর হাকিমের একটি যথার্থ আদেশ	৫০
হলে গিয়ে ছবি দেখার দিন কি আসবে?	৫২
গণতন্ত্র চায় ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতায়ন, গণমাধ্যম তা নিশ্চিত করে	৫৪
গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা, কিছু অন্য প্রসঙ্গ	৫৭
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন	৬২

www.pathagar.com

আগামীর বাংলাদেশে গণমাধ্যমই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠান

সমাজের নানা কিছু তুলে ধরতে গণমাধ্যম ওয়াচডগ বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকরা তো আছেই, এর সাথে সাধারণ নাগরিক, নানা ধরনের সুশীল সংগঠনও আজ গণমাধ্যমের ভূমিকা পরখ করে দেখছে যে, কোন ইস্যুতে তারা কী ধরনের ভূমিকা রাখছে। আর সব ক্ষেত্রেই তাদের পর্যবেক্ষণের দিকটা হলো গণমাধ্যম তার যে মৌল নীতিমালা আছে তা মেনে চলছে কিনা।

সাংবাদিকদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা, সত্য তুলে ধরবেন তারা। তারা সংবাদের প্রতি, মানুষের প্রতি ন্যায্য আচরণ করবেন, সংবাদে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। আর এসবই হলো তার জন্য বড় নীতিমালা।

উন্নত বিশ্বে গণমাধ্যম এখন এমন সব দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের মুখোমুখি হচ্ছে যারা প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমের কোনো রিপোর্ট, সম্পাদকীয় বা বিজ্ঞাপন ভালো না লাগলে, কেন ভালো লাগছে না তার কারণসহ বিভিন্ন ধরনের কমিশন বা সংস্থার কাছে অভিযোগ করছে। আবার এসব কমিশন গঠন করছে স্বয়ং গণমাধ্যম মালিক ও সাংবাদিকরাই।

গণতান্ত্রিক সমাজে মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ চায় সাহসী সাংবাদিকতা। কিন্তু এর জন্য শুধু সাংবাদিকদের চেষ্টাই বড় নয়, চাই সমাজের সব মানুষের, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি প্রশাসন ও সুশীল সমাজের সহযোগিতা।

আমরা এখন এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে সাধারণ মানুষ আর গণমাধ্যম কর্মী সবারই প্রচেষ্টা 'ভালো সাংবাদিকতা'। আর তাই সাংবাদিকদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই যে, যা হচ্ছে তা-ই যথেষ্ট। কারণ সমাজের একটি বড় অংশ এখনো মনে করে সাংবাদিকরা মূলত অহংকারী, অসংবেদনশীল এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা অসত্য বলে বা লিখে এবং চাঞ্চল্যসৃষ্টিতে পারদর্শী।

তবে এই নেতিবাচক মনোভাবের পরও মানুষ সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করতে চায়। অনেক সংকটে গণমাধ্যমই মানুষের শেষ ভরসা।

www.pathagar.com

তা হলে কী করা যায়? ঘুরেফিরে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকার কথাটাই আসে। মানুষও অনেক প্রত্যাশা করে। তবে আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাংবাদিকরা শুধু কোনো ঘটনা বা বিষয় কভার করে না, তারা নানা ইস্যুতে বিতর্কও সৃষ্টি করছে। পশ্চিমা বিশ্বে সেলিব্রিটি বা পাবলিক ফিগারদের নিয়ে এটা বেশি হলেও, আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে তা হয় রাজনৈতিক ইস্যুতে।

তাই প্রশ্ন উঠছে, এমন কোনো সাংবাদিকতা কি আসবে যা মানুষকে শুধুই জানাবে না, বরং তাদের অংশীদার হিসেবে দেখবে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সাথে?

তা হবে কিনা জানা নেই। তবে একথা সত্য যে সাংবাদিকতা এখন আর খুব সাধারণ জায়গায় নেই। সাংবাদিকরা চায় এর সংজ্ঞা প্রসারিত হোক। তারা কোনো ঘটনা, কোনো সভা, কোনো বিতর্ক কভার করার পাশাপাশি, এসব ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কীভাবে ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পারে তাও ভাবতে চায়। শুধু সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা নয়, চায় মানুষ কীভাবে তার কঠিন সময়কে অতিক্রম করছে তা জানতে এবং জানাতে।

আর তা করতে গেলে দরকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। গণতন্ত্র আসলে অনেক বেশি করে চায় অনুসন্ধানী রিপোর্টিং। সেই বহুল আলোচিত চতুর্থ স্তম্ভ মডেলেই বলা হয়েছে, জনস্বার্থ আছে এমন সংবাদ প্রকাশ করে গণমাধ্যম সরকারকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করবে। সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা তুলে ধরবে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা তুলে ধরাই সাংবাদিকতার নীতি। এভাবেই গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে সংহত করতে দায়িত্ব পালন করে।

কিন্তু বিষয়টা সহজ নয়। আমাদের মতো দেশে 'রাজনৈতিক অভিজাত'রা কিন্তু বিষয়টি সেভাবে দেখেন না। তারা মুখে বলেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা, কিন্তু বাস্তবে তারা চান গণমাধ্যম শুধু তাদের সাফল্যগাথা তুলে ধরুক। যে সংবাদে মানুষ বিরূপ হয়, সমাজে অসন্তোষ দেখা দেয়, সমালোচনা হয় ক্ষমতায় থাকা কর্তাব্যক্তিরা তা পছন্দ করেন না।

তথ্যই হলো মানুষের ক্ষমতায়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তথ্য মানুষকে সজাগ রাখে, সরকারকে, এমনকি বিরোধী দলকে দায়বদ্ধ করে। আর তাই যদি সাংবাদিকরা সত্য তুলে ধরতে পারে ঠিকভাবে, দলবাজি সাংবাদিকতা পরিহার করে সংবাদের প্রতি, মানুষের প্রতি ন্যায্য আচরণ করতে পারে, সংবাদে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তবে আগামীর বাংলাদেশে গণমাধ্যমই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

মে ৯, ২০১২

www.pathagar.com

একঘেয়ে অবস্থার অবসান ঘটাতে আসবে কি নতুন দিনের সাংবাদিকতা?

আমরা কি কোনো পাঠকের কথা জানি যিনি পত্রিকার পাতা উল্টে বিরক্ত বোধ করেন, বলেন 'না, আমি যা পড়তে চাই তা খবরের কাগজ দিচ্ছে না'। কিংবা কোনো দর্শকের কথা যিনি একই রকম সংবাদ আর অনুষ্ঠান টেলিভিশনে দেখতে দেখতে বিরক্ত?

গণমাধ্যম এমন কোনো পাঠক বা দর্শককে হয়তো সরাসরি চেনেন না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারেন যে পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন সংবাদ পরিবেশনায়, অনুষ্ঠান নির্মাণে। বাংলাদেশে এখন মিডিয়ার প্লাবন চলছে। নতুন সব কাগজ, নতুন চ্যানেল আর অনলাইন সংবাদ সংস্থায় বাজার সয়লাব।

এমন এক সময়ে সাংবাদিকতাটা হচ্ছে কেমন?

সিনিয়র সাংবাদিকরা বলেন সাংবাদিকতা একসময় ছিলো পবিত্র পেশা। এই পেশায় সে অর্থে কোনো অর্থবিত্ত ছিলো না, কিন্তু প্রাণ ছিলো, মানুষ বিশ্বাস করতো। তথ্যের জন্য সংবাদপত্রের উপর নির্ভরতা ছিলো অনেক বেশি। এখন অবশ্য পরিস্থিতি এমন নেই। মানুষ এখন শুধু পত্রিকানির্ভর নয়। আছে তথ্য জানা আর তথ্য জানানোর নানা মাধ্যম। আছে ইন্টারনেট, মোবাইল, অনলাইন সংবাদমাধ্যম, বেতার আর টেলিভিশন। মুহূর্তেই সংবাদ হাতের মুঠোয়।

এই যে এতো মাধ্যম বেড়েছে, তার ফলে বেড়েছে প্রতিযোগিতা। সবাই চায় আগে ছুটতে। কে কার আগে সংবাদ দেবে। সবাই চায় বিশেষ কিছু করতে। ফলে নিরেট, মেদহীন সংবাদ প্রকাশের বা প্রচারের যে নীতি তা ভুলে যায় অনেকেই। অনেক মাধ্যমের সংবাদেই এখন তথ্যের চেয়ে থাকে অনেক বেশি গল্প, থাকে মতামত। থাকে না তথ্যের প্রমাণ, থাকে না সব পক্ষের কথা।

মানুষ তথ্য চায়, নিজেও তথ্যপ্রবাহের এই ঢেউয়ে যোগ দিতে চায়। সেই চিন্তা থেকেই সিটিজেন জার্নালিজম বা নাগরিক সাংবাদিকতার শুরু। আজ অনেকে সাধারণ মানুষও তথ্য দিচ্ছে সংবাদ মাধ্যমকে। রিপোর্ট লিখে পাঠকরাও হয়ে উঠছেন সাংবাদিক। এই সাংবাদিকতা মূলত হচ্ছে অনলাইন মাধ্যমে। এই

www.pathagar.com

নাগরিক সাংবাদিকরা কেউ বেতন পান, কেউ পান না। কিন্তু তাদের উৎসাহের কমতি নেই।

আর এক নতুন ধরনের সাংবাদিকতা হলো ব্লগিং। ব্লগাররা তথ্য দিচ্ছে, মতামত দিচ্ছে। এক ধরনের সক্রিয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।

এই যে এত আয়োজন এর মোদ্দা কথাটা কি? আসলে সে যুগ আর নেই। তথ্য আর একমুখী কোনো বিষয় নয়। গণমাধ্যম একা দিয়ে যাবে, মানুষ পড়বে, শুনবে বা দেখবে তা নয়। আসলে এর আর এখন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। প্রযুক্তির উৎকর্ষে কোনো না কোনোভাবে মানুষ তথ্য পাচ্ছে। সেন্সর করে, আইন করে নিষিদ্ধ করে মানুষকে তথ্য থেকে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

বিকল্প সব মাধ্যম গড়ে উঠছে, কারণ মানুষর তথ্য চাহিদা শুধু নয়, মানুষ নিজেও তার মতো করে কিছু বলতে চায়। যে পন্থায় গণমাধ্যম তথ্য দিচ্ছে, তা তাদের মতো না হলে নিজেই ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। তাছাড়া নাগরিক ব্যস্ততায় এত সময় নেই যে অনেক বড় বড় রিপোর্ট বা ফিচার পড়বে। মানুষ চায় ছোট, স্মার্ট অথচ তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট।

চ্যানেলগুলো, পত্রিকাসমূহ এ দিকটায় নজর দিতে চায়। তাই টেলিভিশনে একটি ঘটনায় একটি রিপোর্ট নয়। হচ্ছে একাধিক রিপোর্ট। সাথে থাকছে সংশ্লিষ্ট নানা মানুষের মতামত। টেলিভিশনের বার্তাকক্ষ তো পারলে ৩০ মিনিটের সংবাদ চাংকের পুরোটাই চায় একটি ঘটনার তথ্য আর বিশ্লেষণ দিতে। আর এমনটা বেশি ঘটে কোনো দুর্ঘটনা বা রাজনৈতিক বিষয়ে।

এর একটা ভয় হলো এ ধরনের প্রবণতা অনেক সময় খুব ছোট ঘটনাকে বড় করে তোলে। অনেক সত্যিকারের সংবাদ স্থান পায় না টিভি পর্দায় বা পত্রিকার পাতায়। তাতে সব সংবাদের প্রতি নজর দেয়া হয় না। সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয় নাগরিক সব রাজনৈতিক বেড়াজালের খবরে। কোনো ঘটনাকে বড় করে দেখাতে গিয়ে সত্য থেকে সরে গিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

যে কোনো এক ঘটনা বা বিষয় নিয়ে মানুষ আসলেই এতো বিস্তারিত জানতে চায় কি? সত্য জানতে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সে যাওয়াটা হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সমালোচকরা অবশ্য বলেন, গণমাধ্যম এখন অনেক বেশি পারদর্শী চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে। ব্রেকিং নিউজের নামে অনেক অতি সাধারণ তথ্যও চালিয়ে দেয়া হয়।

রাজনীতি, অপরাধ বিষয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টির এই প্রবণতায় হারিয়ে যেতে বসেছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এক শ্রেণীর সম্পাদক বা সিনিয়র সাংবাদিক যত সময় দিচ্ছেন টিভি পর্দায়, ততটুকু দিচ্ছেন না নিজের কাগজে। দু-একটি কাগজ বাদ

www.pathagar.com

দিলে প্রায় সব পত্রিকার পাতা ভরে থাকছে রাজনৈতিক পক্ষ-বিপক্ষের খবরে। একই পরিস্থিতি টেলিভিশন চ্যানেলেও।

প্রায় ২০টিরও বেশি চ্যানেল। আছে সংবাদভিত্তিক চ্যানেল। আরো আসছে। প্রত্যেকেই চায় ভিন্ন কিছু করতে। কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় সবার রানডাউন প্রায় এক। পরিস্থিতি বদলাবে নতুন দিনের সাংবাদিকতা।

আর সব খাতের মতো মিডিয়ায় ঢুকছে বড় পুঁজি। কিন্তু আমরা তো এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, গণমাধ্যম শুধুই লাভ-ক্ষতির ব্যবসা নয়। তাই এখানে কে কী উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করছে, কে কীভাবে তার মিডিয়াকে ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন হলো কে করবে? সরকার করতে গেলে অযথা সেন্সরশিপের শংকা আছে। সেক্ষেত্রে দায়িত্বটা কি সাংবাদিকদেরই?

মে ২২, ২০১২

www.pathagar.com

কোলাবোরেটিভ জার্নালিজম

পাঁচ বছর আগেও এমনটা কেউ ভাবেনি। এখন সামাজিক গণমাধ্যম সাংবাদিকতার ধরন বদলে দিয়েছে। পশ্চিমারা একে বলছে collaborative journalism বা সহযোগিতার সাংবাদিকতা।

প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা, বিষয়টা এমন নয়। প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে একে আলিঙ্গন করেছে। ফেইসবুক আসে ২০০৪-এ আর টুইটার ২০০৬-এ। প্রথম কটা বছর ছিলো শুধুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আজ যার নেট কানেকশান আছে, বা যার ইন্টারনেটে যাওয়ার সুযোগ আছে তিনি এই দুইয়ের একটিতে থাকতে চাইছেন। তাই বড় বড় তো বটেই, এমনকি খুব সাধারণ মানের সংবাদমাধ্যমও চায় এই সামাজিক মাধ্যমে নিজে থাকতে, বা তাকে ব্যবহার করতে।

সাংবাদিকরাও এখন এই সামাজিক মাধ্যমের বহুল ব্যবহারকারী। শুরুটা ছিলো এমন যে, নিজের কোনো ভাবনা এই মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া আর তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা। আর এখন তা হয়ে উঠেছে সহযোগিতা সাংবাদিকতার নতুন দিগন্ত।

সামাজিক মাধ্যম হয়ে উঠছে তথ্য অনুসন্ধানের বড় ক্ষেত্র। আমাদের এখানে বিষয়টি যদিও কোনো মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের কাজে বেশি ব্যবহার হচ্ছে, পশ্চিমা দুনিয়ায় কিন্তু তা একটু অন্যরকম। অনেক বড় বড় পত্রিকা একে কাজে লাগাচ্ছে তথ্য অনুসন্ধানে বা কোনো খবরের পক্ষে অভিমত তৈরিতে।

ফেইসবুক বা টুইটারের বন্ধুরা হয়ে উঠছে content curators, সূচি বা বিষয়বস্তু বিচারক ও বিশ্লেষক। অনেক ফেইসবুক বা টুইটারের বন্ধু পালন করছে সম্পাদকের ভূমিকা। ফেইসবুক বা টুইটার শেয়ারিং তো সাদামাটা ব্যাপার এখন। পশ্চিমা দুনিয়ায় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, মন্তব্য আহ্বান করা কিংবা নিজের ওয়েব ভারসনের কোনো খবরের লিংক সামাজিক মাধ্যমের সাইটগুলোতে আপলোড খুবই স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের এখানেও তার বিস্তার ঘটছে ব্যাপকহারে।

হয়তো সম্পাদকীয় বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ফেইসবুক আর টুইটারের প্রতিক্রিয়া যে কোনো তথ্যের নতুন দিক উন্মোচন করে তাতে সন্দেহ নেই। পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ বা সামাজিক মাধ্যমের তথ্যের জন্য হয়তো নতুন ধরনের সম্পাদকীয় নীতিমালা ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

সংবাদ প্রচার আর ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার খুব সাধারণ ব্যাপার এখন। প্রশ্ন হলো আসছে দিনগুলোতে কী হতে পারে? যেহেতু সাংবাদিকতা এখন অনেক বেশি সহযোগিতার মাধ্যমে হচ্ছে তাহলে পাঠকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ধরনটা কেমন হতে পারে?

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা তাদের রিপোর্ট সমৃদ্ধ করতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছে সে বিষয়ে সে তার বন্ধুদের সাহায্য চাইতে পারে। সামাজিক সাইটে এমন অনেক বন্ধু আছে যাদের সাথে খুব কমই দেখা হওয়ার সুযোগ আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ মানেই এই ভার্চুয়াল জগতে দেখা-সাক্ষাৎ। তাই সেসব বন্ধুর অনেকেই হয়ে উঠতে পারে অনেক সংবাদের সূত্র।

এসব মানুষের অনেকেরই বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনেক সমৃদ্ধ। অনেকের কাছেই আছে অনেক চমকপ্রদ তথ্য । আর নানা মত তো আছেই যা রিপোর্টারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে আরো পরিপূর্ণ করে। ফেইসবুকে বা টুইটারে ছোট্ট এক মন্তব্য হয়ে উঠতে পারে বড় ক্লু। এ এক নতুন ধরনের সাংবাদিকতা যা সত্য তুলে ধরতে অবদান রাখছে। পত্রিকা বা টেলিভিশনের অনলাইন সংস্করণে যে অংশগ্রহণ ক্রমেই হয়ে উঠছে সংলাপের মঞ্চ।

তবে ভাবনাও আছে। এখানে যারা স্ট্যাটাস দেন বা টুইট করেন সব তথ্য কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। সব ব্যাখ্যা সততার সাথে নাও হতে পারে। নিজের জ্ঞান আর বিবেক ব্যবহার করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সাংবাদিককে।

জুন ৯, ২০১২

www.pathagar.com

সাংবাদিকের একমাত্র নিয়ন্ত্রক তার মূল্যবোধ

সাংবাদিকতা দ্রুত বদলাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। কিন্তু বদলেছে কি আমাদের আমলারা?

অনেকেই হয়তো বলবেন, না, বদলায়নি আমাদের আমলারা। আমি বলি কি– বদলেছে, তারা হাঁটছে, তবে সামনের দিকে নয়, পেছনের দিকে। তারা আরো পেছনে নিতে চায় বাংলাদেশকে। নীতিমালার নামে একবার বেসরকারি টিভির অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চায়, সেখানে ব্যর্থ হয়ে এবার লেগেছে অনলাইন মাধ্যমের পেছনে। নীতিমালায় কি আছে তা আর বিস্তারিত বলছি না।

বলছি কতটা খবর রাখেন তারা পৃথিবীর? যুগের পরিবর্তনের? এই বদলে যাওয়া গত দুটি দশকে অভূতপূর্ব গতি আর মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা নিরন্তর সেই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সতর্ক।

সাংবাদিকতার ভাষা, নীতি, আদর্শ, প্রযুক্তি এসব বিষয়ে সময়ের সাথে থাকার এক নিরলস সংগ্রামে লিপ্ত সাংবাদিকরা। সময়েরই দাবি অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলো। অনলাইন কেন? উত্তর খুব সহজ– সমাজ থেকে এগিয়ে থাকার সংকল্প। এটাই এই মাধ্যমের ধর্ম, এখানকার কর্মীদের সংকল্প।

দ্রুত পরিবর্তনশীল নতুন ধরনের এই সাংবাদিকতায় তরুণদের পদচারণাকে যারা ভয়ের চোখে দেখে তারাই এর কণ্ঠ চেপে ধরতে চায়। কিন্তু তারা কি জানেন এই মাধ্যমে যারা আছেন, যারা আসছেন, তাঁরা অকম্প, অদম্য, অবিচল?

এ সময়ের সাংবাদিকরা তাঁদের চারপাশকে দেখে, বুঝে, বিচার করেন তাদের মতো করে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পরামর্শে বা নিয়ন্ত্রণে থেকে নয়। আর এই স্বাধীন, স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়েই অনলাইন লেখক, সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন– আদর্শ আর মূল্যবোধের।

সাংবাদিকতাকে সরকারি কোনো নীতিমালা দিয়ে পরিচালনা করা যায় না। সাংবাদিকদের যদি সত্যি কোনো নিয়ন্ত্রক থাকে তবে তা তার মূল্যবোধ। আর এই মূল্যবোধ গড়ে উঠে মুক্ত, অবাধ, স্বাধীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। তাই অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের জন্য কোনো নীতিমালার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ আজ অনেক দিন ধরেই সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে তার রাষ্ট্রকাঠামোয় সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসনের সংকট, অন্যদিকে এই সমাজের কিছু গোষ্ঠী আছে যারা পালাক্রমে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে, কিন্তু তাদের নতুন চিন্তার সাহসের বড় ঘাটতি।

যারা প্রযুক্তিকে নিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর হতে চায় তারা আর যাই হোক আপন ঐতিহ্যে আস্থা হারায়নি। এই কণ্ঠস্বর একদিকে যেমন সৎ ও দেশপ্রেমিক, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ, উদার, শিক্ষাদীপ্ত। নীতিমালা করে এই কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে না আবার সমাজের প্রগতিকেই আটকে দেয়া হচ্ছে, তা ভাববেন আশা করি নীতিনির্ধারকরা।

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১২

www.pathagar.com

রিপোর্টিং অত্যাবশ্যকীয়

গণমাধ্যম : সাধারণ ধারণা

মানুষের ধারণা সাংবাদিকরা মূলত অহংকারী, অসংবেদনশীল এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা অসত্য বলে, লেখে এবং চাঞ্চল্যসৃষ্টি করতে আগ্রহী।

এই নেতিবাচক মনোভাবের পরও মানুষ সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমকে বিশ্বাস করতে চায়। মানুষ আর সাংবাদিকদেরও চেষ্টা 'ভালো সাংবাদিকতা' বেঁচে থাকুক।

প্রত্যাশা

মানুষ চায় মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম। সাহসী সাংবাদিকতা।

কিন্তু এর জন্য শুধু সাংবাদিকদের চেষ্টাই বড় নয়, চাই সমাজের সব মানুষের, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি প্রশাসন ও সুশীল সমাজের সহযোগিতা।

সাংবাদিকদের কাছে প্রত্যাশা– সত্য তুলে ধরবেন তারা। তারা সংবাদের প্রতি, মানুষের প্রতি ন্যায্য আচরণ করবেন, সংবাদে ভারসাম্য বজায় রাখবেন, তারা পক্ষপাত করবেন না ইত্যাদি। আর এসবই হলো তার জন্য বড় নীতিমালা।

খবরের সূত্র

সবমসময় খবরে বেনামি কোনো সূত্র নয়, চাই সূত্রের নাম-পরিচয়। তাহলে খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই খবর যারা দেন, সেসব সূত্রের সাথে সাংবাদিকের আচরণ হতে হবে ভদ্র, সুরুচিসম্পন্ন এবং ন্যায্য। তার সাথে কতটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে, কতটুকু দূরত্ব রাখতে হবে তা নিজেকেই বিচার করে চলতে হবে।

কখন সূত্রের কাছে যেতে হবে

প্রতিটি সংবাদেই সূত্র উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যেগুলো সমাজে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। যেগুলো মানুষ এর মধ্যেই জেনে গেছে সেসব ক্ষেত্রে সূত্র উল্লেখ প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

সংবাদে সূত্রের ব্যবহার

সাধারণত প্রথম দুই অনুচ্ছেদেই সূত্র উল্লেখ করা দরকার। আর অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ক্ষেত্রে প্রথম অনুচ্ছেদেই করতে হয়। যদি চলমান ঘটনা হয়, তাহলে প্রতিটি নতুন তথ্য দিতে গেলে সূত্র উল্লেখ জরুরি। 'অভিযোগ রয়েছে' এমন কথা লিখে কোনো ধরনের মানহানির মামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সহজ হবে না।

সূত্রের সাথে সাংবাদিকের আচরণ

সরাসরি উপস্থিত হয়ে, কিংবা ফোনে, ফ্যাক্সে বা ই-মেইলে, যেভাবেই হোক না কেন, কোনো খবর জানতে কারো সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই নিজের পরিচয়, প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে হবে। কিসের ভিত্তিতে কী জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। অনেকেই আছে on-the-record বা off- the-record সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নন। তাকে তা বুঝিয়ে দেয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব। যিনি খবর জানাচ্ছেন তিনিও জানেন কেন তিনি কথা বলছেন। যে তথ্য তিনি দিচ্ছেন তা দিতে তিনি কোনো ধরনের ঝামেলায় পড়ছেন না, তাও তাকে নিশ্চিত হতে হবে। সবসময় চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব তার উদ্ধৃতি ব্যবহারে তার সম্মতি আদায় করা।

তথ্য রেকর্ড করা

সাংবাদিক তথ্য রেকর্ড করবেন এটাই স্বাভাবিক। তা নোট নিয়ে হোক বা টেপ-এ রেকর্ড করে হোক। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে,তথ্যের ন্যায্যতা বজায় রাখতে এটা জরুরি। তবে না জানিয়ে টেপ-এ বা মোবাইলে কারো কথা রেকর্ড করা বেআইনি।

সবচেয়ে ভালো সূত্র

কোন খবরে কার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেলো তা যদি উল্লেখ থাকে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পাওে না। কিন্তু তারপরও মনে রাখতে হবে যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার দায়দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সাংবাদিককেই নিতে হয়। যতটা সম্ভব সূত্রের নাম আর অবস্থান উল্লেখ থাকতে হবে। এতে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। আবার নাম উল্লেখ করলেও তথ্য যাচাই করতে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে তথ্যের ভারসাম্য বজায় আছে কিনা। বিশেষ করে কোনো দ্বন্দ্ব বা মধ্যস্থতার বিষয় যদি থাকে।

সবচেয়ে দুর্বল সূত্র হলো যার নাম দেয়া যায় না। বেনামি সূত্রের বরাতে তথ্য ব্যবহার করা যায় যখন রিপোর্টার নিশ্চিত যে তার দেয়া তথ্য সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং এই তথ্যটি তিনি ছাড়া আর কারো কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। একটি তথ্য

www.pathagar.com

যা এমনিতেই পাওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে বেনামি সূত্রের ব্যবহার কাম্য নয়।

'একটি সূত্র', 'সূত্রসমূহ', 'পর্যবেক্ষক', 'মহল' এ ধরনের সংবাদ সূত্র আসলে অস্পষ্ট, অগ্রহণযোগ্য। তেমনিভাবে 'ওয়াকিবহাল মহল', 'নির্ভরযোগ্য সূত্র' জানায় বলে কোনো তথ্য দেয়া হলে তা সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে না।

কোনো রাষ্ট্রীয় বা কর্পোরেট চুক্তি নিয়ে রিপোর্ট করতে হলে যতটা সম্ভব সূত্রকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। যদি বলা হয় 'একজন কর্মকর্তা জানান', 'উচ্চপর্যায়ের নির্বাহী' জানান, তাহলে নিশ্চিত হতে হবে এই চুক্তির সাথে তার সরাসরি সংশ্লিষ্টতা আছে, যদিও ঐ ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান।

বেনামি সূত্রের খবরে অতি সাবধানতা, অতি মাত্রায় যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

একক সূত্র

কোনো একক সূত্রের ভিত্তিতে খবর সাধারণভাবে কাম্য নয়। যদি খবরটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, যদি এই সূত্র ছাড়া আর কোথাও তথ্য পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে একক সূত্রের খবর প্রকাশ করা যায়, যদি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা রাজি থাকেন। নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই কর্তৃপক্ষীয় অবস্থানে আছেন। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে রিপোর্টারের নিজস্ব track record যাচাই করা জরুরি। শুধু নীতিনির্ধারক হলে একক সূত্র ব্যবহার করা যায়, তবে খুবই সতর্কতার সাথে।

সূত্রের সাথে সততা

যার কাছ থেকে তথ্য নেয়া হয় তার সাথে সততা বজায় রাখতে হয় নাম-পরিচয় ব্যবহারে, তার উদ্ধৃতি ব্যবহারে। কোনো উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার কাম্য নয়। সব ক্ষেত্রে সংবাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি খবরে সব পক্ষের সাথে কথা বলতে হবে। আবার বুঝতে হবে কোন পথে হাঁটছেন তিনি? কিংবা সূত্র নিজেও সাংবাদিককে ভুল পথে নিচ্ছেন কিনা? কিংবা নিজের কোনো অযাচিত স্বার্থ হাসিল করছেন না তো? রিপোর্টারের এই সন্দেহই তথ্য নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখে। তার কাছে বড় 'সঠিক তথ্য', 'ভারসাম্য' আর 'ন্যায্যতা'।

জুলাই ১৫, ২০১২

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী আর পুলিশের সাধারণ টার্গেট কি সাংবাদিকরা?

মাত্র কদিন আগে বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস গেলো। ঘটা করে না হলেও প্রতি বছর দিবসটি পালন করে সাংবাদিকদের নানা সংগঠন। সব সময়ই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কিংবা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা উঠে।

তবে এবার ব্যতিক্রম। মনে হচ্ছে বেশ অনুশীলন করেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আর লাইসেন্সধারী মাস্তান বাহিনী হামলে পড়েছে সাংবাদিকদের ওপর। কারণটা কী? বাংলাদেশের অনেক ঘটনা বা বিষয়ের মতো এটিও অজানা।

আমাদের তথ্যমন্ত্রী প্রায় সময়ই দাবি করেন বর্তমান সরকার সংবাদমাধ্যম আর সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে সরকার সচেষ্ট। আরেকটি কথা বলেন, সেটি হলো, এই সরকার তথ্য অধিকার আইন সংসদে পাস করেছে। যদিও এই আইন করে গেছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা শুধু এই সংসদে অনুমোদন দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে ১৯৯০-এ স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারায় (নাকি নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক ধারায়) দেশ ফেরার পর সেই অর্থে দেশে লিখিতভাবে গণমাধ্যমের আর কণ্ঠরোধ করা হয় না। এই কাজটিও করেছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আইনের যে ধারাবলে সংবাদপত্র বন্ধ করা যেতো তা রহিত করেছেন তিনি।

কিন্তু অলিখিতভাবে সেন্সর আছে, হুমকি আছে। না ছাপানো, না বলার, না দেখানোর পরামর্শ আছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতি, সাংবাদিকদের প্রতি অসহিষ্ণুতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিঘাংসায় রূপ নিচ্ছে। একদল ক্ষমতায় থেকে কোনো বিশেষ ভবনের তুর্কি তরুণদের দিয়ে টিভি আর পত্রিকায় হুমকিস্বরূপ দিতো পরামর্শ, আরেকদল সংসদে দাঁড়িয়ে সম্পাদকদের, পত্রিকার নাম ধরে বিষোদ্গার করে।

ঐতিহাসিকভাবে এ দেশে যে সুশাসনের সমস্যা তার কারণেই আসলে গণমাধ্যমের প্রতি এই আচরণ। রাজনৈতিক দলগুলো মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে ঠিকই, তবে তাদের ভালো লাগে মোড়লগিরি। মনের গহীনে বাস করে সামন্তভাবনা।

www.pathagar.com

অন্তরে প্রগতিশীলতা নেই বলেই আমাদের শাসকগোষ্ঠী সবসময় চায় কায়দা-কানুন করে গণমাধ্যমের কণ্ঠ চেপে রাখতে। তা না পারলে নির্যাতন করতে।

তবে সরকার যেমনই হোক যে বিষয়টি বেশি পীড়াদায়ক তা হলো আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের তথাকথিত কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ। ঐতিহাসিকভাবে গণবিরোধী ও অদৃষ্ট এই গোষ্ঠীটা এখন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। ফলে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সুবিধাদি আদায়ের পাশাপাশি এই চক্রটি এখন নৈতিকতার চরম অবনতিতে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক আনুগত্য দেখে নিয়োগ, বদলি আর দায়িত্ব নিয়ে এক-একটি সার্ভিস ক্যাডার হয়ে উঠছে ভয়ানক সব সংগঠন।

পুলিশ কি এখন কোনো শৃঙ্খলা বাহিনী? নাকি পেটোয়া বাহিনী? কখনো কখনো ফারাক বোঝা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

যাক, সে আলোচনা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। শুধু ভাবছি আমরা সাংবাদিকরা আসলে আছি কেমন। কোথাও কোনো নিরাপত্তা নেই। বেডরুমে খুন। এখন নতুন করে জানান দিল যে অফিসে ঢুকেও খুন করা যায়। বিডিনিউজের সাংবাদিকরা মারা যাননি। কিন্তু যারা এসেছিল তারা খুনের নেশায় উন্মত্ত ছিল। পুলিশ রাজপথে সাংবাদিকদের রক্তাক্ত করে। শোরগোল হলে একদিন বিরতি দিয়ে আদালত পাড়ায় ধর্ষণ ঠেকাতে সাংবাদিক-আইনজীবী এগিয়ে গেলে তাদেরও রক্তাক্ত করে।

এমনিতে সাংবাদিকতা পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ। নানা স্বার্থান্বেষী মহল সাংবাদিকদের ওপর নাখোশ থাকে। তাদের রোষানল থেকে বাঁচতে সাংবাদিকের শেষ ভরসাস্থল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের হয়ে সে কাজটি করে পুলিশ। কিন্তুসেই পুলিশই যখন নির্যাতকের ভূমিকায় অগ্রণী, তখন কার কাছে যাবো আমরা?

কতদিন চলে গেল সাগর-রুনি খুন হয়েছেন। এই পুলিশ তার কোনো রহস্য বের করতে পারেনি। ব্যর্থ পুলিশের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছে র‍্যাব। তারাও কতটা করতে পারবে সংশয় আছে। যে পুলিশ বিভাগ উচ্চ আদালতে গিয়ে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করেছে, সে বিভাগের শীর্ষ কর্তারা নির্লজ্জের মতো এখনো পদ আগলে আছেন। তারা নিজেরা সরে দাঁড়াননি। সরকারও তাদের অপসারণ করেনি। ফলে তাদের অধীনস্থরা এখন যা পারছে তা করছে। তারই মহড়া ছিল আগারগাঁওয়ে সাংবাদিকদের ওপর হায়েনার মতো আক্রমণ। দু দিন যেতে না যেতেই এই বাহিনীর লোকজন আদালত পাড়ায় বিচার চাইতে যাওয়া তরুণীকে মা-বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাংবাদিক-আইনজীবীরা বাধা দিলে তাদের রক্তাক্ত করা হয়। দেশের মানুষের মানবাধিকার নিয়ে যে সাংবাদিক-সমাজ কলম ধরে তাদের অধিকারই আজ ভূলুণ্ঠিত, তারা আজ আহত।

সন্ত্রাসীরা বিডিনিউজ অফিসে ঢুকে সাংবাদিকদের খুন করতে চেয়েছে। দেশে

www.pathagar.com

কোনো সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে ঢুকে এমন সন্ত্রাসী হামলা এটাই প্রথম। পুলিশের সাম্প্রতিক যে দক্ষতা আর ইচ্ছাশক্তির যে প্রমাণ পাচ্ছি তাতে নিশ্চিত হতে পারছি না যে প্রকৃত সন্ত্রাসীদেরও ধরতে পারবে তারা বা ধরবে।

প্রণিধানযোগ্য আইজিপি নানা প্রণিধানযোগ্য বাক্য ছুড়ছেন। বলছেন, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য পুরো পুলিশ বাহিনীকে দোষ দেয়া ঠিক হবে না। কথাটি সত্য। আমরা বলতে চাই না যে গুটিকয়েক অসফল কর্মকর্তার জন্য গোটা বাহিনীকেই দোষ দিতে হবে। যে কাজ সাংবাদিকদের নয়, তাই করছেন তারা। পথে নামছেন, বিক্ষোভ করছেন। দোষীদের শাস্তি দাবি করছেন। আশ্বাসও মিলছে। কিন্তু সাংবাদিক-দম্পতি খুনের পর সেই ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম এখন এতটাই হাস্যকর যে কোনো আশ্বাসই আর আমাদের আশ্বস্ত করে না।

জুলাই ২৩, ২০১২

www.pathagar.com

গণমাধ্যম কি থাকছে?

বিশ্বের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় ম্যাগাজিন *নিউজউইক*-এর আর প্রিন্ট সংস্করণ পাওয়া যাবে না। কেমন যেন বেদনা বোধ হয়। ছাত্রজীবনে, যেটুকু টাকা পেতাম, তার থেকে খুব কষ্ট করে বাঁচিয়ে অনেক কষ্ট করে একটা *নিউজউইক* কিনতাম। কখনো পারতাম, কখনো পারতাম না। যখন কেনা হতো, মনে হতো আহ, একটা কাজ হলো।

সেই *নিউজউইক* আর কাগজে পড়া হবে না। পড়তে হবে অনলাইনে। *নিউজউইক* এই পথ বেছে নিলো, তবে কি এর আজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী *টাইম* ম্যাগাজিনও একই পথে হাঁটবে? শোনা যাচ্ছে তেমনটাই। কথা উঠছে বিশ্বব্যাপী, তবে কি প্রিন্ট মিডিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হতে চলেছে?

যদি একটু গভীরভাবে দেখি তাহলে এটা মনে হতে পারে যে, গণমাধ্যমই হারিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। যা থাকবে তা হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ। *নিউজউইক* আসলে বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে কাগজের সংবাদমাধ্যম আর থাকছে না। খোদ *নিউজউইক*ই যখন থাকছে না, বা থাকতে পারছে না, তখন অন্যরা আর কতটুকু পারবে?

নিউজউইক আর *টাইম*, তাদের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। এই দুটি ম্যাগাজিন মার্কিন সীমানা ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছিল বিশ্বের কাগজ। একসময় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে কেবল টেলিভিশন।

সিএনএন আর *বিবিসি*, স্যাটেলাইট যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যখন-তখন শুধু খবর দেয়া শুরু করেনি, এদের পর্দায় পাওয়া যেতে থাকে তাৎক্ষণিক খবর থেকে শুরু করে ঘটনার বিশ্লেষণও। কিন্তু অসাধারণ লিখনশৈলী আর বোদ্ধা সব লেখকের লেখায়, যে কোনো বিষয়ে বিশ্লেষণ পড়তে, কিংবা ঘটনার আরো গভীরটা জানতে, এই ম্যাগাজিন দুটো সবসময়ই ছিল মানুষের প্রথম পছন্দ। টেলিভিশন সে জায়গা থেকে এই দুই ম্যাগাজিনকে হটাতে পারেনি।

কিন্তু সব কিছু বদলে দেয় ইন্টারনেট। যোগাযোগের এই দ্রুত, সহজ পথ এখন গণমাধ্যমের অস্তিত্বের জন্যই হুমকি। অসাধারণ সব লেখা আর দারুণ সব ছবি নিয়ে অসংখ্য ম্যাগাজিন প্রতিদিনই আসছে এই ডিজিটাল ধারায়। একটা ইন্টারনেট

www.pathagar.com

কানেকশান থাকলেই এগুলো পাওয়া যায় বিনামূল্যে অথবা খুব সামান্য মূল্যে।

আর এই ইন্টারনেট কানেকশান তো শুধু ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটারে সীমাবদ্ধ নেই, মোবাইল হ্যান্ড সেটের মাধ্যমে তা চলে আসছে মানুষের হাতে হাতে। আগ্রহ থাকলে যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময় মানুষ পড়ে নিতে পারছে দারুণ সব লেখা, বিষয় বা ঘটনার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ, কিংবা বড় বড় সব লেখকের কলাম।

কেউ চাইলে এই লেখা তার কম্পিউটারে সেভ করে রাখতে পারছে, এমনকি, সেভ না করেও কেউ শুধু সেই তারিখে গিয়ে পড়তে পারছে। একসময় প্রিন্ট মিডিয়ার একটি বড় সুবিধা ছিল কাগজ সংগ্রহ করে রাখা। এখন আর তার দরকার হচ্ছে না।

অনলাইন ম্যাগাজিন পাঠকের জন্য সহজ, শস্তা। যে কোনো বিবেচনায় এই ডিজিটাল সংস্করণ প্রিন্ট সংস্করণের চেয়ে কম মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সাংবাদিকরা নিজেরাও এখন অনেক পড়ছেন অনলাইন সংস্করণ, রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছেন অনলাইন সাইটগুলো। সাংবাদিক, কর্পোরেট সিটিজেন, সবাই ছুটছেন ল্যাপটপ থেকে আই-প্যাডে।

এই সহজলভ্যতাই একমাত্র কারণ নয় তার পাঠকপ্রিয়তার। মানুষ তথ্যের একমুখী প্রবাহ থেকে বের হয়ে আসতে চাইছিল অনেক দিন ধরেই। অনলাইন সংস্করণ মানুষকে সেই সুযোগ করে দিচ্ছে, প্রিন্ট মিডিয়ার একমুখী সাংবাদিকতার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

পাঠক সুযোগ পাচ্ছে তার মতামতও দিতে, কোনো আলোচনায় নিজেকে রাখতে, এমনকি দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে। প্রিন্ট মাধ্যমে তার কোনো সুযোগ নেই। নিজের কথা তুলে ধরতে আছে কেবল অপেক্ষা।

ইন্টারনেটে যা চায় ইউজার তা লিখতে পারছে, সম্প্রচার করতে পারছে। একটি স্মার্ট ফোন হাতে থাকা মানে বিশ্বব্যাপী তার যোগাযোগ। একসময় যে ক্ষমতা ছিল মিডিয়া মোঘলদের, গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ায় তা পৌঁছে গেছে সাধারণের কাছে। আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই গণমাধ্যমের। অনলাইনে যারা কাজ করেন, তাদের চেষ্টা তো আছেই, ইন্টারনেটের নিজেরই একটি ক্ষমতা আছে তার সাথে মানুষকে জড়িয়ে নেয়ার।

তবে এখানে আশঙ্কা আছে আক্রান্ত হওয়ার। এই সম্পদের বিশালতা যারা জানে, যারা এও জানে যে, এই মাধ্যমের দুর্বল দিক, তারা হ্যাক করতে পারে, হ্যাক করে সব উপাত্ত নিয়ে নিতে পারে, নষ্ট করে দিতে পারে। ইন্টারনেটের গণমাধ্যম হয়ে উঠার সীমাবদ্ধতা সেখানেই।

www.pathagar.com

প্রিন্ট বা টেলিভিশনে, কেউ সংক্ষুব্ধ হলে প্রতিবাদ পাঠানো থেকে শুরু করে যেতে পারে আদালত পর্যন্ত। কিন্তু ইন্টারনেটে এর উত্তর সাথে সাথেই দিচ্ছে, এমনকি যিনি সরাসরি সংক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, এমন মানুষও।

বর্তমানে যে অপলেখ আইন কার্যকর আছে, তা আছে সনাতনী ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের ধারণা থেকে। কিন্তু ফেইসবুকে যে কোটি কোটি একাউন্ট তাতে মানুষের ব্যক্তিগত অনেক তথ্য থাকে যা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ধারণাকে পাল্টে দেয়।

আমাদের সামনে এমন এক মাধ্যম, যা মানুষই ব্যবহার করে। অনেক বেশি মানুষকে জড়িয়ে আছে এই মাধ্যম, কিন্তু তা গণমাধ্যম নয়। কারণ দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধ আর দায়িত্বশীলতার প্রথাগত ধারণার বাইরে নতুন কিছু ভাবছে এই মাধ্যম।

অক্টোবর ২৪, ২০১২

www.pathagar.com

আতাউস সামাদ, মনেপ্রাণে একজন রিপোর্টার

জীবনের পথ চলায় যাদের কাছ থেকে কিছু শিখেছি, অবশ্যই সেই তালিকায় উপরে থাকবেন আতাউস সামাদ স্যার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ার সময় স্যারের সাথে প্রথম পরিচয়। বিভাগে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর কাজ শুরু করলাম *বাংলাদেশ অবজারভারে*, বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে। সে সময় *অবজারভারই* ছিলো সবচেয়ে বড় ইংরেজি কাগজ। অনেক বাংলা দৈনিকের চেয়েও বেশি ছিল এর প্রচারসংখ্যা।

স্যার জানলেন একদিন। বললেন, 'তুমি *অবজারভারে* আছো? আমার সাংবাদিকতার বড় ভিত্তি এই *অবজারভার*।' দেখা হলেই বলতেন তার *অবজারভারের* দিনগুলোর কথা। কতটা ভয় পেতেন মূসা ভাইকে (এবিএম মূসাকে)। কত ভালো সাংবাদিক ছিলেন শহিদুল হক। কতটা স্টাইলিশ ছিলেন মিন্টু ভাই (এনায়েতউল্লাহ খান)।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা তখন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতাদের রিপোর্টই পত্রিকার লিড। কখনো পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ, কোনোদিন বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর লড়াই, আবার কোনোদিন ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যেই বিভক্তির কারণে সংঘর্ষ, প্রাণহানি।

আতাউস সামাদ একদিকে আমার শিক্ষক, আবার মাঠে-ময়দানে তাঁকে পেতাম রিপোর্টার হিসেবে। কাজ করেন *বিবিসিতে*। ক্যাম্পাসে যত গোলোযোগ, আমি দেখেছি পরিণত বয়সেও কতটা পরিশ্রম করছেন তিনি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন তথ্য যাচাই-বাছাই করতে।

স্যার ক্লাসে যেমনটা বলতেন, কোনো ঘটনা কভার করতে গিয়ে দেখা হলেও বলতেন 'ইশতিয়াক, (স্যার আমাকে কোনোদিনই রেজা বলেননি, যে নামে সবাই ডাকেন) মনে রাখবে একিউরেসি হলো রিপোর্টের সব কিছু। যত ভালো ভাষায় তুমি লেখো না কেন, তথ্য সঠিক না হলে কোনো দাম নেই।'

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে কত হাজার হাজার শব্দ লিখেছি। কিন্তু কয়েক

www.pathagar.com

মিনিটের একটি রিপোর্ট বিবিসিতে স্যারের কণ্ঠে শোনার জন্য আমরাও কত সময় অপেক্ষা করেছি। ক্যাম্পাসের কোনো ঘটনা আমাদের চেয়ে কে বেশি জানতো! তবু কান পেতে রইতাম আতাউস সামাদের কণ্ঠে কী ভেসে আসে তা শুনতে। কারণ, আমরা সে সময় যারা ক্যাম্পাস রিপোর্টার ছিলাম, তারা সবাই মানতাম স্যার মনেপ্রাণে একজন রিপোর্টার। যার কাছে বড় ধর্ম একিউরেসি।

স্যার দীর্ঘ সময় লিখেছেন সাপ্তাহিক *হলিডেতে*। পাস করে যাওয়ার পর আমিও *অবজারভার* ছেড়ে *মর্নিং সান* হয়ে *দ্য ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেসে*। সেখানে কলাম লেখেন তিনি। আমি রিপোর্টার। তখন আমিও একটু-আধটু লিখি *হলিডেতে*। মোবাইল ফোন তখনও চালু হয়নি। তাই যখন-তখন ফোন করে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্যারের সাথে দেখা হলেই লেখার প্রসঙ্গ টানতেন, জানাতে ভুলতেন না কোথায় আমার মতের সাথে স্যার একমত, কোথায় নন।

তারপর টেলিভিশনে কাজ করতে এসে স্যারের সাথে একটু দূরত্ব। কিন্তু একসময় স্যারও এলেন এনটিভির প্রধান নির্বাহী হয়ে। আবার শুরু হলো স্যারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ। আমার এক টক শোতে স্যার এসেছিলেন আলোচক হিসেবে। বিষয় ছিলো সম্প্রচার সাংবাদিকতায় বাংলাভাষা। আরটিভিতে যে আগুন লেগেছিলো তাতে হয়তো পুড়েছে সেই আলোচনা অনুষ্ঠানটিও।

স্যার একটি কাগজ বের করেছিলেন *সাপ্তাহিক এখন*। প্রতিটি সংখ্যা পাঠাতেন। বলতেন লিখতে। স্যারের কথায় লিখেওছিলাম দু-একবার। স্যার *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকীয় লিখতেন। *এখন* পত্রিকায়ও লিখতেন। কিন্তু প্রতিটি লেখাই ছিল একজন রিপোর্টারের লেখা।

একদিন *এখন* পত্রিকার অফিসে বসে আছি স্যারের সামনে। আমি চা পান করছি। তিনি সম্পাদকীয় লিখছেন। অনেক সময় ধরে লিখছেন, আর এ পত্রিকা, সে পত্রিকা পড়ছেন, কী যেন খুঁজছেন, দু-একজনকে ফোন করছেন।

আমি বললাম স্যার কী খুঁজছেন? বললেন, 'কিছু ইনফরমেশন যাচাই করে নিচ্ছি'। সম্পাদকীয়তে তথ্য একটু-আধটু এদিক-সেদিক হতে পারে, আমার ধারণা এমনটাই ছিল। এখানে প্রাধান্য পাবে মতামত, সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত। কিন্তু তিনি তো আতাউস সমাদ, মনেপ্রাণে রিপোর্টার। প্রতিটি তথ্য যাচাই করতেই হবে যে তাকে।

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১২

www.pathagar.com

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, একটু ভেবে বলুন

স্মরণকালের বৃহত্তম ব্যাংক ডাকাতি ঘটেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকে। অবশ্য তা হয়েছে কাগজপত্র জালিয়াতি করে, বন্দুকের মুখে ক্যাশ লুট করে নয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপসী বাংলা শাখার ব্যবস্থাপকসহ কতিপয় বড় কর্মকর্তা আর সমাজের প্রভাবশালী কিছু লোকের যোগসাজশে হলমার্ক নামের এক অখ্যাত প্রতিষ্ঠানসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়ার নামে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে বের করে নিয়েছে।

এই ঘটনা জানাজানি হবার পর থেকে প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বা সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কী করেছে? তারা কি তাদের দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে? সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ চুপ করে ছিলো, কারণ তারা নিজেরাই এই দুর্নীতির সাথে জড়িত। যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই জালিয়াতির অভিযোগ, সেই অখ্যাত হলমার্ক গ্রুপ শুধু সোনালী ব্যাংক নয়, একইভাবে টাকা তুলে নিয়েছে আরো দুই সরকারি ব্যাংক জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক থেকেও। আবার সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা শুধু হলমার্ককে নয়,এভাবে শত শত কোটি টাকার ঋণ সুবিধা দিয়েছে আরো বাণিজ্যিক গ্রুপকে।

একটি কথা খুবই পরিষ্কার যে, সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সবাই না হোক, কেউ না কেউ অবশ্যই এটা জানতো কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়েছে। নয়তো একটি সাধারণ শাখা থেকে ৩০০০ কোটি টাকা বেরিয়ে যেতে পারে?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি জোর দিয়ে বলতে পারে যে সেও জানতো না বিষয়টি? অনেকটাই পরিষ্কার যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছে। তবে দেরিতে হলেও যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়কে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের সুপারিশ করেছে তখন অর্থমন্ত্রী যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তা সব বিবেকবান মানুষকে আহত করেছে। পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়ার সুপারিশ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এখতিয়ার-বহির্ভূত বলে অর্থমন্ত্রী মূলত রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন, সব ব্যাংকের অভিভাবক বাংলাদেশ ব্যাংককে অপমান করেছেন। এর

www.pathagar.com

মাধ্যমে তিনি দুর্নীতিবাজদের উৎসাহিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। শুধু তা নয়, অর্থমন্ত্রী আরো অবাক করা কথা বলেছেন মঙ্গলবার এক সেমিনারে। তিনি বললেন চার হাজার কোটি টাকা লোপাট বড় দুর্নীতি নয়, এটাকে বড় করেছে গণমাধ্যম।

সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের যে সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, তা করা হয়েছে আইনের মধ্যে থেকেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থমন্ত্রী এমনটা বললেন কেন? তার তো আইন জানার কথা। তবে কি তিনি এটা করেছেন এজন্য যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে তার দলের লোকজন আছে? কিংবা পদ্মা সেতু প্রকল্পের মতো এখানেও প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টার নাম উঠে এসেছে সেজন্য?

অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলার আগে একবারও কি ভেবেছেন যে সোনালী ব্যাংকের এই টাকা সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সঞ্চয়? যারা লুটপাট করেছে তারা দলের হলেও তারা আসলে লুটেরাই।

দিন বদলের স্লোগান দিয়ে আসা এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল আগের সরকার আর দলীয় লোকজন যে লুটপাট করেছে তা থেকে তারা ভিন্ন পথে হাঁটবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উল্টোটা।

যে অখ্যাত তানভীর মাহমুদ জালিয়াতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটেছে, তাকে উৎসাহিত করেছেন অর্থমন্ত্রী। উৎসাহিত করেছেন তার দলের ভেতরে থাকা দুর্নীতিবাজদের। উৎসাহিত করেছেন উপদেষ্টা নামধারী আরো কিছু ক্ষমতালিপ্সু মানুষদের।

সাংবাদিক হিসেবে দুঃখ পেয়েছি যে, তিনি পুরো ঘটনায় দায় চাপিয়েছেন গণমাধ্যমের ওপর। তার কাছ থেকে আশা ছিল তিনি গণমাধ্যমের প্রশংসা করবেন এমন একটি বড় অর্থ কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেয়ার জন্য। কিন্তু উল্টো তিনি দুষলেন।

অর্থমন্ত্রীর কাছে একটি অনুরোধ, একটু ভেবে কথা বলবেন। কাকে, কখন, কী কারণে রাবিশ বলছেন বা ভর্ৎসনা করছেন একটু চিন্তা করে করবেন। এতে আপনারই মঙ্গল হবে বেশি।

সেপ্টেম্বর ৫, ২০১২

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রের সাধনা দিয়ে কি বড় কিছু হয়?

যারা উচ্চ আসনে থাকেন তাদের কথা আমরা আমজনতা খুব মন দিয়ে শুনি। উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা যখন খুব বালখিল্য কথাবার্তা বলেন তখন আমরা দিশেহারা হই। ভাবি কোথায় যাব আমরা? যাদের আমরা এতো এতো ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাই তারা যখন মানুষ নিজের ঘরে খুন হলে বলেন 'বেডরুম পাহারা দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়', কিংবা 'ঘরে তালা মেরে ঈদের সময় বাড়ি যাবেন' তখন আমরা বুঝতে পারি সত্যি কতটা নিরাপত্তাহীন আমরা এই সমাজে।

এটি শুধু এখন নয়। রমজানে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় এক ডাকসাইটে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন 'পেঁয়াজ না খেলে কী হয়'। যুগ যুগ ধরে শাসকরা সাধারণের সাথে এমনটা করছে।

সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা তো দূরের কথা, মানুষ এখন শাসকদের কথায়ও অতিষ্ঠ। উন্নয়ন মানে তো শুধু বারবার ভালো ধানের ফলন নয়। মানুষ কতটা তার জীবনমান বাড়াতে পারল, কতটা কর্মসংস্থান হলো, কতটা নিরাপদ বোধ করে সমাজে চলাফেরা করতে পারলো– সেগুলো অনেক বড় মাপকাঠি।

হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এ দেশের একটি সন্তান, তা সে ছেলে হোক বা মেয়ে, একা একা আসতে পারে। কিন্তু ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে নামার পর সে আর বিমানবন্দর থেকে একা বাইরে বের হতে সাহস করে না। আমাদের শাসকরা বদলে যায়, কিন্তু বদলায় না এই শংকা। দলগুলো যত বেশি ভোট পাচ্ছে, দিন দিন এই নিরাপত্তাহীনতা আরো বাড়ছে। কত কঠিন পথ পার হয়ে আসে দূর দেশ থেকে, কিন্তু নিজ দেশে এসে একটি মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে এক অসহায় প্রাণী হিসেবে।

অর্থনীতি কেমন চলছে তা এক জটিল বিতর্ক। কিন্তু এটুকু সবাই বোঝেন যে, বাংলাদেশে এখন আর বিদেশী বিনিয়োগ আসে না। দেশী বিনিয়োগও প্রায় বন্ধ। কারণ অনেক। ব্যাংকের সুদের হার এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তা দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানই লাভের মুখ দেখবে না। নেই গ্যাস-বিদ্যুৎ, নেই রাস্তাঘাট। এতো সমস্যার পরও যদি কেউ বিনিয়োগ করেন তবে তার জন্য অপেক্ষা করে সরকারি

www.pathagar.com

বিভিন্ন পরিদপ্তরের নানা হয়রানি, আর চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য। শাসক বদলায়, এই সংস্কৃতি বদলায় না।

অনেক আশা মানুষের। তাই ঘুরেফিরে দুটি বড় দলকেই বারবার অদল-বদল পরীক্ষা করে। কিন্তু কিছু পায় না। এবার একটু বেশিই দিয়েছিলো। কিন্তু গত তিন বছরের বেশি সময়ে মানুষ কী দেখলো। ক্ষমতাসীনরা যে বার্তা প্রায় প্রতিদিন মানুষকে দিচ্ছেন, তা কোনোভাবেই আশাপ্রদ নয়। মানুষের এখন আর বুঝতে বাকি নেই যে এরা সর্বস্তরেই অযোগ্য। সাধারণ কর্মী থেকে মন্ত্রী, মানুষ এখন কাউকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

অনেক কথায় ঢাকতে চাইলেও অন্তত পদ্মা সেতু নিয়ে যা হয়েছে, তাতে মানুষের মনে ধারণা তৈরি হয়েছে আগের সরকারে যেমন ছিলো, এই সরকারেও দুর্নীতিবাজ আছে।

সর্বস্তরে এই যে অবিশ্বাস তার একটি বড় কারণ মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতা। দেশের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড, পোশাক শ্রমিক নেতা আমিনুল হত্যা, ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়াসহ নানা উপলক্ষে পুলিশের অকর্মণ্যতা মানুষকে আর সুশাসনের আশ্বাস দেয় না। এর বাইরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ কলেজগুলোতে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের কর্মকা এই দেশকেই এক গভীর সংকটে নিপতিত করেছে। তাদের কর্মকা এমনই যে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীকেও চোখের জল ফেলতে হয়।

গত প্রায় দুই দশকে দলবাজির যে সংস্কৃতি দেশের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে তার থেকে পরিত্রাণের কী উপায় তা কেউ জানে না। ক্ষমতার মসনদে দলের রঙ বদলায়। কিন্তু মানুষের জীবন-মান বদলায় না। তা আরো নিচের দিকে চলে যায়।

যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে, যে ব্যক্তিগত ও দলগত অসহিষ্ণুতার অনুশীলন হচ্ছে, তা দেখে ভয় লাগে, আমাদের সন্তানেরা কী শিক্ষা পাচ্ছে? কথায় কথায় শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, নিজের মতের সাথে না মিললে, অতি সম্মানিত ব্যক্তিকেও যেনতেনভাবে অপমান করা, চরিত্র হনন করা অতি সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এমন অসহিষ্ণুতার বাতাবরণে দেশের উন্নতি হয় না। এটা হলো ক্ষুদ্রের সাধনা। তা দিয়ে কি বড় কিছু হয়?

মে ২৭, ২০১২

www.pathagar.com

কোন পথে হাঁটবো আমরা?

বাংলাদেশে নাকি মানুষের দু ধরনের রক্ত– 'এ' আর 'বি'। এর বাইরে আর কোনো ব্লাড গ্রুপ থাকলে তারা সংখ্যালঘু। সমাজে রাজনৈতিক বিভক্তি এমন চরম আকার নিয়েছে যে এখন আর কাউকে নিরপেক্ষ থাকা বা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যেন সবার জন্য এমন চরমপন্থী অবস্থান বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে।

এই সংস্কৃতি এখন নেই কোথায়? সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী সব। এমনকি টেলিভিশনের টক-শোতে জাতিকে জ্ঞান দিতে এসেও জাতির জ্ঞানী-গুণীরা জানিয়ে দিচ্ছেন কে কোন দল করেন বা সমর্থন করেন।

কিন্তু শিক্ষক, সাংবাদিক বা আইনজীবী আমাদের জন্য দর্শনটি কী হওয়া উচিত? সরকারের কাজকর্মের একজন সমালোচনা করতে পারেন। তার অর্থ কি এই যে তিনি বিএনপি সমর্থক? আবার বিরোধীদলের সমালোচনা করলে কি তিনি আওয়ালীগের রাজনীতি করেন? সরকারের বা বিরোধীদলের সমালোচনার অর্থ কি একজন সমালোচক সামগ্রিকভাবে সে দলের সমালোচক?

এ এক কঠিন সময় আত্মমর্যাদা আছে, চিন্তার জগতে মনুষ্যত্ব আছে, সংস্কৃতি আছে এমন মানুষের জন্য। তারা কী করবে? 'এ' আর 'বি'-এর মাঝে অবস্থান নিয়ে মধ্যপন্থা বেছে নেবে? নাকি চরম সত্যটা বলে দু পক্ষের রোষানলে পড়বে?

আমাদের দেশে পালাক্রমে দুটি দল ক্ষমতায় আসছে। নির্বাচনে জেতার পরপরই শাসকদলের কর্মীরা মরিয়া হয়ে উঠে সবকিছু দখলে নেয়ার জন্য। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও মদদ দেয় এসব কাজে। আর যে নেতা-নেত্রীরা থাকেন উপরের সারিতে তারা হয়ে উঠেন দূরের কোনো মানুষ। কিংবা ক্ষমতার স্পটলাইটে তাদের চোখ এমন করে ধেঁধে যায় যে তারা নিজেদের রঙিন জীবন ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না।

আর যারা ক্ষমতার বাইরে থাকেন তাদের কাজ কত তাড়াতাড়ি সরকারকে হেয় করা যায়। টেনে-হিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামানো যায় কিনা। জ্বালাও-পোড়াও করে, মানুষের জীবনকে অস্থির করে, সেই সুযোগে ক্ষমতার মসনদে বসা যায় কিনা।

এ অবস্থা চলছে কয়েক দশক ধরে। মানুষ এখন ভাবছে এই দুই চরমপন্থী

www.pathagar.com

অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কী করে? মানুষের প্রত্যাশা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হোক। কারণ মানুষ দেখছে এরা সবাই সামাজিক, প্রশাসনিক, মানবিক মূল্যবোধের উপর স্থান দিচ্ছে দলীয় স্বার্থকে। তারা পালাক্রমে ক্ষমতায় আসে, আর মানুষকে বুঝতে ভুল করে। আমরা ভাবি মানুষ তো ভুল থেকেই শিক্ষা নেয়। কিন্তু তা আর হয় না। আবার ভুল। আবার অরাজকতা।

কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে যে দেশে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি বা প্ল্যাটফরম এখনো প্রস্তুত নয়। তাই গণমাধ্যম বা সুশীল সমাজের দায়িত্ব কী হবে? সজাগ থাকা যাতে দেশ নৈরাজ্যের দিকে চলে না যায়।

এক কঠিন সময় আজ আমাদের জন্য। যে সংঘাতময় রাজনীতি আমরা দেখছি তা দেশকে না শূন্যতার দিকে নিয়ে যায় তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। একদিকে শাসকের মঞ্চে যারা আছেন তাদের সুশাসনের সমস্যা। অন্যদিকে যারা এর বিরোধিতা করছে তাদের জোট এমন শক্তি যারা সবসময় এ দেশের প্রগতির পথের অন্তরায়। তারা সাম্প্রদায়িক, তারা জঙ্গি।

তাই সময় এসেছে যারা দেশ নিয়ে ভাবেন তাদের নতুন করে ভাববার। কোনো একদিকে একতরফা কথা বললে রাজনীতির পসরা ঘরে তুলবে প্রতিক্রিয়াশীর চক্র। অন্তত একটি কাজও যদি করা যায়, সমাজে এই ধারণা স্থির করা যায় যে, প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা দূর হবে, যে স্থানে যে তৎপরতা দরকার, প্রশাসন তা করবে, তবেই মানুষ কিছুটা হলেও সুশাসনের সুঘ্রাণ পাবে। হবে কি তা? আশা নিয়েই তো বাঁচে মানুষ।

মে ১৬, ২০১২

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক সময়ের টেলিভিশন রিপোর্টিং: কিছু প্রশ্ন

প্রয়াত সাংবাদিক মিনার মাহমুদ আত্মহননের কদিন আগে এসেছিলেন একাত্তর টেলিভিশনের এক আলোচনায় যোগ দিতে। বিষয় ছিলো আমাদের নতুন সংবাদকর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা; নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা জানানো। এ ধরনের বেশ কয়েক দিনের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন অনেক তারকা সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

অনেক কথা শুনেছি। অনেক উপদেশ ছিলো অনেকের দিক থেকে। কিন্তু মিনার মাহমুদের একটি কথা কানে বাজছে এখনো। তিনি বলেছিলেন, 'একজন রিপোর্টারকে তথ্য বের করার জন্য অনেক প্রশ্ন করতে হবে, প্রশ্ন করতে জানতে হবে, যতক্ষণ না নিজের কাছে মনে হবে যে তথ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, ততক্ষণ প্রশ্ন করে যেতে হবে।'

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বইতেই পড়েছি রিপোর্টারের অনেক গুণের একটি হলো Should have ability to ask critical questions। এই যে প্রশ্ন তা সাধারণ প্রশ্ন নয়, ক্রিটিক্যাল বা জটিল প্রশ্নও করতে জানতে হবে।

কিন্তু তা কি দেখছি আমরা ইদানীং? পত্রিকা কিংবা অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলোতে যদিওবা অনেক ক্রিটিক্যাল দিক পাওয়া যায়, টেলিভিশনগুলোয় তা অনেকাংশে নেই।

শুরু করা যাক সাংবাদিক-দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকা দিয়ে। প্রথম দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু তা আর হয়নি। এরপর পুলিশের মহাপরিদর্শক সংবাদ সম্মেলন করে জানালেন তদন্তে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তাও কিছু বোঝা গেলো না। এরপর প্রায় প্রতিদিনই ডিবির মনিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফিং দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিটি স্তরে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে, অন্তত টিভির পর্দায়, তা হলো একতরফা এসব বক্তব্য প্রচার। একটি বড় সময় যখন পার হয়ে গেলো, হত্যাকারীদের ধরা গেলো না তখনো শুধু এসব কর্মকর্তার কথাই শুনেছি আমরা।

'পুলিশ বাহিনী কি অদক্ষ হয়ে পড়েছে, সে কারণেই হত্যার কোনো ক্লু বের করা সম্ভব হচ্ছে না?' এই প্রশ্নটি একজনকেও করতে দেখা গেলো না, অন্তত প্রচার

www.pathagar.com

হতে দেখিনি।। পুলিশের দক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন আছে তা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে। এখন এই হত্যাকাণ্ড নতুন করে তদন্ত করছে র‍্যাব।

একই ধরনের সংবাদ প্রচার দেখা গেলো সৌদি দূতাবাস কর্মকর্তার খুনের বেলায়। যে যা বলছে, মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরছে, কথা রেকর্ড করে চলে আসছে, সংবাদ প্রচার করছে।

আসা যাক খিলগাঁও থেকে হারিয়ে যাওয়া শিশু মায়েশার প্রসঙ্গে। ডাকাতদল ডাকাতির সময় তাকে তুলে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ দাবি করে। আবার তারা তাকে ফেলেও যায় মিরপুরে। স্থানীয় লোকজন শিশুটিকে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। তারপর সে তার মা-বাবার কাছে ফেরত যায়। এখানেও দেখা গেলো পুলিশ সাংবাদিকদের কাছে দাবি করছে, তাদের তৎপরতার কারণে শিশুটিকে তারা ফেলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোনো প্রশ্ন দেখা গেলো না এখানে পুলিশের কৃতিত্ব কতটুকু? ডাকাতরা ফেলে গেছে, মানুষ শিশুটিকে পথে পেয়ে পুলিশে খবর দিয়েছে। পুলিশের কৃতিত্ব হবে যদি ডাকাতদলটিকে ধরতে পারে।

ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়ার প্রতিবাদে বিএনপি তিন দিন হরতাল করেছে। প্রতিদিন দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিংবা অন্য কোনো নেতা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন। তাদের একতরফা ব্রিফিং বারবার প্রচার পেয়েছে। অনেক ক্রিটিক্যাল প্রসঙ্গ ছিলো। সেগুলো বাদ দেয়া যায়। কিন্তু একটিবারও শোনা গেলো না লাখ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর বিষয়টি তাদের বিবেচনায় আছে কিনা। তারা কি হরতালের আগে বাসে মানুষ পুড়িয়ে মারার কোনো দায় স্বীকার করেন কিনা। তিন দিন হরতাল শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সংবাদ সম্মেলনেও এমন প্রশ্ন ছিলো কিনা, অন্তত চ্যানেলগুলোর পর্দায় দেখা যায়নি।

তেমনিভাবে ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী আর আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু একজনকেও প্রশ্ন করতে দেখা গেলো না যে, ঘটনা যেভাবেই ঘটুক সরকার কি এর দায় এড়াতে পারে?

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ইলিয়াস নিখোঁজের ঘটনায় বক্তব্য দিয়েছেন। সমবেদনা জানিয়েছেন। সরকারের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যদি বিবেকের তাড়নাতেই তিনি কথা বলেন, তাহলে প্রশ্ন ছিলো তার বিবেক কি একবারও নাড়া দেয়নি দরিদ্র বাসচালককে পুড়িয়ে মারা কিংবা লাখ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে? কোনো প্রশ্ন করতে দেখা গেলো না কাউকে। শুধুই মাইক্রোফোন সামনে ধরে থাকা।

www.pathagar.com

কাউকে কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। আত্ম-উপলব্ধি থেকে লেখা। অনেকেই হয়তো বলবেন আপনিও তো টেলিভিশনের বার্তা বিভাগ চালান। আপনার চ্যানেলের লোকজনকে তাহলে কি শেখালেন? এই প্রশ্ন আমার নিজের কাছেও। আমরা কি প্রশ্ন করতে ভুলে গেছি, নাকি আমাদের মনোবল নেই, নাকি আমাদের দক্ষতাই নেই প্রশ্ন করে তথ্য বের করে দর্শককে জানানোর?

এপ্রিল ২৪, ২০১২

www.pathagar.com

সামাজিক মাধ্যম, যা দেখবো আগামীতে

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে বাড়ছে সামাজিক মাধ্যমে মানুষের পদচারণা। ফেইসবুক, টুইটার, লিংকডইন ব্যবহারকারী এখন ঘরে ঘরে। যদিও ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগ এখনও নগরকেন্দ্রিক, তবু আমরা দেখছি দূর অঞ্চলের মানুষের উপস্থিতি এসব সামাজিক মাধ্যমে।

প্রথমেই আসা যাক মোবাইল ফোন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে এর ব্যবহারকারীর ঘনত্ব নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। সেটের দাম নাগালের মধ্যে, সিম কানেকশান প্রায় বিনামূল্যে আর কোম্পানিগুলোর প্রতিযোগিতাই তো কে কতো কম কল চার্জ করতে পারে। এমন এক বাস্তবতায় মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ছে দ্রুতগতিতে। আর মোবাইল ফোনে এফএম রেডিও শোনা তো এখন যে কারো জন্য খুব স্বাভাবিক বিষয়। এর মধ্যেই মোবাইল ফোনের কি-প্যাডে বাংলা ব্যবহারের নির্দেশনা এসেছে এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখবো বড় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো মোবাইল ফোনে কোনো অ্যাপ্লিকেশন চিন্তা করছে তার ব্র্যান্ডকে আরো জনপ্রিয় করতে।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে শুধু কি ব্যাক্তিমানুষের উপস্থিতি থাকবে? মনে হচ্ছে না। উদ্যোক্তা, ছোট-বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের বাণিজ্যের প্রসারে এমনকি পত্রিকা তার পাঠক ধরে রাখতে উপস্থিত হচ্ছে এসব সাইটে। পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ধারণা দিতে, কাস্টমার বা স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে থাকবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সরব পদচারণা।

শুধু আর ফেইসবুক ফ্যানপেজ নয়, আসছে সামাজিক বিপণন। ফেইসবুকে যে হারে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে, বিশেষ করে তরুণ সমাজের, তাতে করে যারা ই-বাণিজ্যের সাথে জড়িত তারা দূরে থাকতে পারছে না। ফ্যাশন শোর খবর, কিংবা নতুন কোনো ইভেন্ট কিছুই বাদ যায় না এখন ফেসবুকের দেয়াল থেকে।

বাংলাদেশে ব্লগে লেখালেখি এখনো অনেক সীমিত। কিন্তু বাড়ছে দ্রুততার সাথেই। ভারতে টাটাসহ কিছু নামকরা কোম্পানি নিজেরা ব্লগ ব্যবহার করছে,

www.pathagar.com

ব্লগারদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশেও আমরা এমনটা দেখতে পাবো।

বাড়বে ফোরাম। ব্লগারদের ফোরাম দৃশ্যমান। দেখবো ফেইসবুক ইউসার ফোরামও। এবং অন্যান্য সামাজিক সাইট ব্যবহারকারীদের ফোরাম। হয়তো দেখা যাবে এসব ফোরামেরও থাকছে ওয়েব ঠিকানা আর সেসবে রাজনৈতিক, সামাজিক ইস্যুতে অনেক লেখা, অনেক বিতর্ক আর অনেক মন্তব্য।

ভারতে কোলাবেরি ডি গানটি জনপ্রিয়তার সব রেকর্ড ভেঙেছে শুধু এর নতুনত্বের জন্য নয়, ফেইসবুক, টুইটারসহ সব সামাজিক মাধ্যমে এর প্রচারের কারণেও। এই সামাজিক মাধ্যমই এখন কোনো কোনো বলিউড ছবির বক্স অফিস। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ততটা আধুনিক নয়, জনপ্রিয় নয়, কিন্তু নাটক আর গানের জগৎ তো এর মধ্যেই প্রবেশ করেছে এই ডিজিটাল জগতে, সামনে আরো সরব হওয়ার অপেক্ষায়।

বোকা বাক্স বলে খ্যাত টেলিভিশনও কি পারছে দূরে থাকতে? ভারতে দেখা যায় প্রায় সব চ্যানেলেরই অপশন আছে কীভাবে দর্শকদের মতামত, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। অনেক টিভি সিরিয়াল, কিংবা ছবি রিলিজ হওয়ার দিনেই ফেইসবুকসহ সামাজিক মাধ্যম সাইটগুলোতে প্রচার চালায়। সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হবে টিভি নাটক আর অনুষ্ঠান, খুব দূরে নয় সেই দিন।

মার্চ ৮, ২০১২

www.pathagar.com

নিউ মিডিয়া, প্রচলিত মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক

পত্রিকা পড়ার অভ্যাসটা কি বদলে যাচ্ছে? কথাটা ঠিক এমন নয়। হাতে কাগজ নিয়ে চা পান করতে করতে পত্রিকা পড়া কমছে। অন্তত নগরজীবনে এমনটা হতে শুরু করেছে। আমি নিজের দিকে যদি তাকাই তবে দেখি দিনের বড় সময় আমার চোখ থাকে অনলাইন বার্তা সংস্থাগুলোর দিকে কিংবা পত্রিকাগুলোর অনলাইন সাইটে। এবং খবর নিয়ে দেখেছি যে, পত্রিকাগুলোর ওয়েব পাঠক প্রচলিত সার্কুলেশন পাঠকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। তবে কি ধীরে ধীরে মানুষ খবর পড়বে শুধু অনলাইনে?

পশ্চিমা বিশ্বে ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তারে পত্রিকার প্রিন্ট সংস্করণ অনেক কমছে। অনলাইনে বাড়ছে পত্রিকা পাঠ। তথ্য আজ শুধু কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষের সম্পদ নয়। আর তাই বলা হচ্ছে, এই নিউ মিডিয়া প্রচলিত মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।

বিশ্বজুড়ে আলোচনা আর বিতর্ক জমে উঠেছে, তাহলে কি বহু দিনে গড়ে উঠা বার্তাকক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সাংবাদিকরা? খারাপ কিংবা ভালো এ বিতর্কে না গিয়েও স্বীকার করতে হবে নতুন ধারার এই সাংবাদিকতা অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তি আর মানুষের চাওয়া বদলে দিচ্ছে।

যা আজ ঘটলো, তার জন্য পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না মানুষ। টেলিভিশন আর রেডিও আসার পর পত্রিকা ধাক্কাটা সামলেছিলো সম্পাদকীয় আর বিশ্লেষণী ক্ষমতার জোরে। কিন্তু নিউ মিডিয়া তো দ্রুততার সাথে তথ্যই দিচ্ছে না, সমাজের নানা স্তর থেকে নিয়ে আসছে বহুমুখী বিশ্লেষণ।

প্রিন্ট মিডিয়ার জয়জয়কার দেখে কথা উঠেছিলো যে সাংবাদিকতা হলো 'literature in hurry'। এখনকার নিউ মিডিয়া দেখলে তারা কী বলতেন কে জানে। তথ্য পাওয়া, তথ্য দেয়া আর তা নেয়া সব ক্ষেত্রেই গতিটাই আসল।

এই যে বদলে যাওয়া সেটা কি শুধু সাংবাদিকদের বদলে যাওয়া? মানুষের তথ্য চাওয়ার ধরন বদলে যাওয়া? না, তা শুধু নয়। বদলে গেছে এর মালিকানার ধরন। সবকিছু এখনই সবিস্তারে বলা হয়তো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু একই সাথে প্রশ্ন উঠছে এই সাংবাদিকতার গুণাগুণ নিয়ে। মানুষ দ্রুততার সাথে তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু কমছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা এখন যেন অনেক বেশি ব্যবস্থাপনার কাজ, সেখানে কমছে সাংবাদিকের স্বাধীনতা। অনেক অপেশাদারের দাপট বাড়ছে এই পেশায়, এমনটাও বলছে কেউ কেউ। তবে সব ক্ষেত্রে যে তা ঠিক এমনটা নয়।

তবে এসবই সাময়িক। বদলে যাওয়ার স্রোতে শুধু নেতিবাচক দিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আগে ভাবতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে পরিচালিত করে গণমাধ্যমকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা যেখানে মজবুত, স্বভাবতই সাংবাদিকতা সেখানে অনেক স্বাধীন।

নিউ মিডিয়ার কথা এভাবে বললে হয়তো ভুল বলা হবে। সাংবাদিকতা আসলে বদলেছে বারবারই। সবসময়ই তা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

নিউ মিডিয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠে আসছে, আর তা হলো এখানে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান কি প্রিন্ট মিডিয়ার মতো শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? কিংবা প্রচলিত অর্থে যে গেট কিপার প্রথা থাকে, তা কি আছে এখানে? আর সিটিজেন জার্নালিজম বা নাগরিক সাংবাদিকতার কারণে কি সংবাদের কনটেন্টের উপর সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ কমছে? এমন সব জিজ্ঞাসাও আছে অনেক ক্ষেত্রে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই মিডিয়ার সম্পাদকরাই। তবে এ কথা তো মানতেই হবে প্রচলিত মিডিয়ার চেয়ে নিউ মিডিয়ায় মানুষের অশীদারিত্ব অনেক বেশি।

আরেকটি বিষয় ভাববার, প্রায় সব অনলাইন মাধ্যমে একই ধরনের সংবাদ দেয়ার প্রবণতা। পশ্চিমা বিশ্বে এ আলোচনা বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশে অবশ্য আমরা দেখছি যে অনলাইন সাইটগুলো এই প্রবণতা থেকে দূরে। তারা যে কোনো সংবাদ দ্রুত, কিন্তু বিশ্লেষণের সাথে দেয়ার চেষ্টা করছে।

উন্নত প্রযুক্তি আসছে, নিউ মিডিয়া আরো আধুনিক হচ্ছে। প্রশ্ন থাকছে একই সাথে কি সংবাদের বৈচিত্র্য বাড়ছে? যদি তা হয় তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সাংবাদিকরা মূলত নিউজ ডেস্ক কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। নিউ মিডিয়ার সংবাদকর্মীদের অনেক বেশি সময় কাটে বার্তাকক্ষে । সংবাদের পেছনে সাংবাদিকের যে ছুটে চলা তা দেখা যায় কম। তবে কি তা অফিস সাংবাদিকতা?

মার্চ ৫, ২০১২

www.pathagar.com

ডার্ক জার্নালিজম

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে। নিজের প্রতিষ্ঠানেরই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলো একটি চ্যানেল। আর কাজটি করেছে একুশে টেলিভিশন। রিপোর্টারের নাম মাহাথির ফারুকি। অভিযোগ দুর্নীতির। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তাকে আবার স্বপদে বহালও রেখেছে একুশে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ।

মাহাথিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এমএলএম ব্যবসার বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট করেছেন। প্রতিটি রিপোর্টই ছিলো বেশ আক্রমণাত্মক। বেশ জোরেশোরেই রিপোর্ট করেছেন মাহাথির। এখন অবশ্য বেশ জোরেশোরেই প্রচারণা পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। যে এমএলএম ব্যবসার বিরুদ্ধে মাহাথির রিপোর্ট করলেন সেই ব্যবসার সাথেই জড়িত তিনি নিজে।

তার নিজের চ্যানেলেই রিপোর্ট হলো যে তিনি এবং তার স্ত্রী গ্লোবাল মানি সুইং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। একুশে টিভির পরিচয়ে এই কোম্পানিতে টাকা খাটাতে মানুষকে প্রভাবিত করেছেন মাহাথির। এক বিনিয়োগকারী অভিযোগ করেছেন, তিনি আর তার স্ত্রী কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

রিপোর্ট হয়েছে দৈনিক যুগান্তরে। এখন পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহরের দেয়াল। কিন্তু কেন এখনো একুশে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি– আমি এটা জানতে কথা বলেছি একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আবদুস সালামের সাথে। তার কথা, 'মাহাথির এমএলএম ব্যবসার সাথে নিজে জড়িয়ে নৈতিকভাবে ঠিক কাজ করেনি, কিন্তু সে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করেছে এমন প্রমাণ এখনো পাইনি'।

মাহাথিরও তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আমরাও পুরো বিষয়টা নিশ্চিত নই যে মাহাথির আসলেই কী করেছেন। আমরা আশা করতে চাই তিনি এ ধরনের কিছু করনেনি।

'ইয়েলো জার্নালিজম' বলে এক ধরনের সাংবাদিকতা আছে। এই সাংবাদিকতা হলো সত্য লেখা বা বলার চেয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, কোনো ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এক পক্ষে নিয়ে যাওয়া। হলুদ সাংবাদিকতায় সত্যতা কম থাকে, সূত্রের

www.pathagar.com

বরাত থাকে কম, মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখে রিপোর্টার। রিপোর্টে থাকে না কোনো ভারসাম্য। ন্যায্যতারও কোনো বালাই থাকে না।

কিন্তু একে কী বলা যাবে? কালো সাংবাদিকতা? বেশ ক বছর আগে *ফর্বস* ম্যাগাজিনে একটা লেখা পড়েছিলাম যার শিরোনাম ছিলো 'ডার্ক জার্নালিজম'। সাংবাদিকতায় সরকারের সেন্সরশিপই বড় সমস্যা নয়, এর চেয়ে বড় সমস্যা সাংবাদিকতার নামে এ ধরনের দুর্নীতি।

এই দুর্নীতি এমন যে অনেক সংবাদই আর আলোর মুখ দেখে না। আবার এমন অনেক সংবাদই করা হয় কোনো না কোনো পক্ষের স্বার্থ হাসিলের জন্য। এ দুটো কাজই হয় অর্থের বিনিময়ে। এই অর্থ রিপোর্টার নিজে হজম করেন বা তার কর্তৃপক্ষের কেউ করে। আর আছে ব্ল্যাক মেইলিংয়ের সংস্কৃতি।

চিনে চেকবুক সাংবাদিকতা নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে *ফর্বস* ম্যাগাজিন এই ডার্ক জার্নালিজমের কথা বলেছে। চেকবই কিংবা নগদ যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের সাংবাদিকতায় এই সংস্কৃতি চলে আসছে এমনটা শোনা যায় সাংবাদিকদের আড্ডাতেই।

'Journalists have many ways to drum up extra cash' বলেছে *ফর্বস* ম্যাগাজিন। আমাদের এখানেও কিছু কিছু সাংবাদিকের অবস্থা দেখলে এমনটা মনে হয়। এমন দু-একজনকে সবাই চেনেন। কী একটা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক তথাকথিত অর্থ-বাণিজ্যবিষয়ক ম্যাগাজিন চালান একজন, সেখানে যা লেখা থাকে তার বেশির ভাগেরই নেই কোনো মান। পত্রিকাজুড়ে থাকে বিভিন্ন ব্যাংক আর বীমা কোম্পানির প্রেস রিলিজ। আর তার বিনিময়ে থাকে সেই সব ব্যাংক আর বীমা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। সেই ব্যক্তি এখন দেশের অন্যতম ধনী সাংবাদিক।

তার অনুসারী আছেন আরো বেশ কজন। এমনই একজনের কাজ হলো বছর বছর ব্যবসায়ীদের পদক দেয়া। তার বিনিময়ে অর্থ আয়। তিনি অনেক চেষ্টা করেও মূলধারার সাংবাদিকতায় থাকতে পারেননি। কিন্তু এখানে তিনি সফল।

এমন অনেক উদাহরণ হয়তো দেয়া যাবে। সে তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো এমনটা হচ্ছে কেন? একটি কারণ হলো দায়বদ্ধতার অভাব। আরেকটি কারণ হলো যদি দেশে দুর্নীতির সংস্কৃতি থাকে, তবে গণমাধ্যমই বা তার থেকে দূরে থাকে কী করে?

সাংবাদিকতায় আছে একটি মুনাফাখোর গোষ্ঠী। এরা আসলে ভুয়া সাংবাদিক। কিন্তু সিস্টেমটাই এমন যে এদের অনেকেই আবার সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন আর সংস্থায়ও বেশ প্রভাবশালী।

www.pathagar.com

ফর্বস ম্যাগাজিন চিনের কিছু কিছু এলাকায় সাংবাদিকতার এমন অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছে 'People say that you can be a fruit stand owner one day and a journalist the next.'। বাংলাদেশেও কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন নয়?

www.pathagar.com

গুড জার্নালিজম

গণমাধ্যমে ইদানীংকালে যেভাবে বড় পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে তাতে একটি ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক যে সাংবাদিকতা একটি ভালো ব্যবসাও বটে। কিছু কিছু কাগজ আর চ্যানেলের লাভের অংকও (যা শোনা যায়) রীতিমতো বিস্ময়কর।

তবে একটি কথা খুব সাধারণভাবে বলেন মানুষ, আর তা হলো 'ভালো সাংবাদিকতা কতটুকু হচ্ছে?' এমন প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়।

এমন একটা অবস্থা শুধু এ দেশে নয়। অনেক দেশেই। কখনো কখনো এমন হয় যে ভালো সাংবাদিকতা মানেই খারাপ ব্যবসা। কারণ যে সংবাদমাধ্যম ভালো সাংবাদিকতার চেষ্টা করে তার উপর বিরূপ হতে পারে বিজ্ঞাপনদাতারা, তার উপর চড়াও হতে পারে প্রভাবশালী গোষ্ঠী। আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী তো লাভের কথাই ভাবেন না, ভাবেন গণমাধ্যম এক হাতিয়ার।

কেন বড় পুঁজিপতিরা মিডিয়া ব্যবসায় আসেন? মিডিয়ার অনেক ক্ষমতা বলে? যদি তাই হয় তা হলে মিডিয়ার ভূমিকা কী হওয়া উচিত? প্রশ্ন উঠছে গণমাধ্যম কি সরকারের করে দেয়া কোনো নীতিমালায় চলবে নাকি নিজেই একটি শুদ্ধ অবস্থান বেছে নিয়ে চলবে? স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়টাকেই শ্রেয় মনে করবেন যাদের ভেতর নীতিবোধ আছে।

একটা কথা বলতেই হবে যে আজকাল বাংলাদেশের বেশ কিছু টেলিভিশন চ্যানেল বিশ্বমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যার কারণে এসব চ্যানেলকে বড় বিনিয়োগে যেতে হয়েছে। একইভাবে বেশ কিছু সংবাদপত্রও হয়েছে অনেক বড় বাজেটে। এই পরিবর্তনটা হয়েছে বেশ দ্রুত, অনেক নাটকীয়ভাবে।

কিন্তু সংবাদ তো শুধু টাকার খেলা নয়। সংবাদ হতে হয় সঠিক, তথ্যনির্ভর, বিশ্বাসযোগ্য। যদি তা নয় তবে তো ভাবতে হবে যে Bad money drives good journalism out of media.

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে পাস করা তরুণ-তরুণীরা আসছে সাংবাদিকতা পেশায়। কোনো কর্পোরেট চাকুরে না হয়ে কেন তারা গণমাধ্যমে আসছে তা তারাই বলতে পারবে। তবে কি দিনে দিনে সাংবাদিকতা আর ব্যবসা

www.pathagar.com

একাকার হয়ে যাচ্ছে? অবশ্য ভালো সাংবাদিকতা আর ভালো বাণিজ্য দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই যদি দুটোই ঠিকমতো হয়।

আজকের সাংবাদিকতা অনেক ক্ষেত্রেই স্ক্যান্ডালকে বড় করে দেখে। এটি অনেকের অভিযোগ। বাস্তবে গণমাধ্যমের কাজ হলো গঠনমূলক বিরোধিতা আর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। আর তা যদি করতে না পারে তাহলে ভালো বাণিজ্য হলেও, ভালো সাংবাদিকতা হবে না।

গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারে, বিশেষ করে সম্প্রচার সাংবাদিকতা আর অনলাইন সাংবাদিকতার বিকাশে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়েছে, কোনো ঘটনা বা বিষয় গোপন রাখা খুব সহজ নয়।

তবে প্রশ্ন উঠছে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিয়ে। কারণ সংবাদমাধ্যমে এখন চলছে চরম প্রতিযোগিতা। যখন ঘটনা ঘটছে প্রতিযোগিতার দৌড়ে কেবল তা সাথে সাথে প্রচারই করছে না, বিশ্লেষণও করছে। সাংবাদিকদের এটি জন্য এমন একটি চ্যালেঞ্জ যেখানে তার বিচারক্ষমতা থাকাটা খুব জরুরি।

আমরা বিডিআর বিদ্রোহের সময় দেখলাম অনেকগুলো চ্যানেলে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত কত দুর্বল। এমনকি খুব বিখ্যাত রিপোর্টারও শুধু বিদ্রোহী সৈনিকদের দেয়া তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করেছেন। তারা একবার বুঝতে চেষ্টা করেননি সৈনিকরা বিদ্রোহ করে শৃঙ্খলা ভেঙেছে, তারা তাদের কমান্ডিং কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে। সেই রিপোর্টার একবারও ভাবেননি তারা যাদের হত্যা করেছে, তাদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলছে, তখন তাদের স্বজনরা কতটা কষ্ট নিয়ে এসব টিভি পর্দায় দেখছেন!

কীভাবে সংকটকালে সম্পাদকীয় বিচার করতে হয়, কীভাবে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হয় তার একটা পরীক্ষা ছিলো বিডিআর বিদ্রোহ। আমরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি এই ঘটনা থেকে।

সম্প্রচার যা-ই করি না কেন, যতই লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচারের জয়গান গাই না কেন, দিন শেষে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের শক্ত নৈতিক অবস্থানই পুরো সম্প্রচার কার্যক্রমের ক্রেডিবিলিটি নিশ্চিত করে। তেমনি প্রিন্ট মিডিয়াতেও যতই মাটির তলা থেকে তথ্য নিয়ে আসি না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ দেখতে চায় পত্রিকা কতটা ন্যায়-নীতির পথে হাঁটছে?

জুলাই ১৭, ২০১২

www.pathagar.com

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও এর প্রতিক্রিয়া

২০০৫ সালে ডেনমার্কের পত্রিকা জিল্যান্ডস-পস্টেন হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর কার্টুন প্রকাশ করলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় বিশ্বজুড়ে। তখন পত্রিকাটি নিজের সমর্থনে বলেছিলো এটি তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টি গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি।

এই যে বাকস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়, তা নানা পরিপ্রেক্ষিত ও বিবেচনায় ভিন্ন হতে পারে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দেখা হয়েছে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে। বলা হয়েছে, এই বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা 'বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য', তবে তা যেন হয় অন্যের অধিকার বা মর্যাদা হরণ না করে কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্ন না করে।

কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে আঘাত করার জন্য এই অধিকার কতটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা মানবাধিকার তা ভাবতে হয়। মার্কিন নাগরিক সাম বাসিলে তার 'ইনোসেন্স অব মুসলিমস' ছবির মাধ্যমে, আর ফরাসি পত্রিকা মুহাম্মদকে নিয়ে কার্টুন ছেপে কোটি কোটি মুসলমানের মনে আঘাত করে যে নজির রেখেছেন তা কোনোক্রমেই দায়িত্বশীল মত প্রকাশর পর্যায়ে পড়ে না।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? লিবিয়ায় রাষ্ট্রদূতসহ মানুষ পুড়িয়ে মারা, মিশর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে জঙ্গি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাও কি যৌক্তিক হয়েছে?

গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা সম্ভবত ভেঙে যেতে বসেছে ৯/১১-এর পর থেকেই। বিশ্বব্যাপী মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মাঝে মাঝেই ঘটছে মুসলিমবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড আর এসবের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে খুবই রক্তক্ষয়ী। হযরত মুহাম্মদ (সা) বা ইসলাম এত ক্ষুদ্র নয় যে একটি ছবি বা একটি কার্টুনের কারণে তার অবমাননা হবে। তবে এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের যে বড় ধরনের বিভেদ তৈরি হয়েছে, তাদের দূরত্ব বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

তাই সময় এসেছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে ভাবার। অন্যের অনুভূতিকে মর্যাদা দিয়ে, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুভূতির মতো অতি স্পর্শকাতর বিষয়কে মর্যাদা দিয়ে মত প্রকাশ করার দিকে নজর দেয়া জরুরি। এমন মত প্রকাশ নয়, যা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তবে যারা এসব মানতে চান না, তাদের প্রতিক্রিয়ায় এমন কিছুও করা ঠিক নয় যা আরো বেশি ভয়ংকর?

ফরাসি ম্যাগাজিন অত্যন্ত আপত্তিকর কার্টুন প্রকাশ করেছে মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে। দেশটির প্রধানমন্ত্রীও এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি হননি। শুধু তা নয়, যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে পত্রিকার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি হয়নি, সেই ফ্রান্স সরকারই আবার ব্রিটিশ রাজবধূ কেট-এর নগ্ন ছবি সরিয়ে নিতে ক্লোসার পত্রিকাকে নির্দেশ দিয়েছে। এই আচরণ স্ববিরোধী এবং তা অন্যকে অসহিষ্ণু করে।

পাকিস্তান বর্তমান বিশ্বে এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা খুব কমই দেখা যায়। আর বিশ্বের কোথাও কিছু ঘটলে তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ঘটে এই পাকিস্তানেই। পাকিস্তানিদের এই ধর্মান্ধ আচরণ বাংলাদেশের কোনো কোনো গোষ্ঠীকেও উৎসাহিত করে। কোনো ছোটখাটো ছুতোয় তারাও সুযোগ নিতে চায় এ দেশে জঙ্গি তৎপরতা চালাতে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এতটাই অসাম্প্রদায়িক যে তারা খুব একটা সফল হতে পারে না। তবে ভয়ানক কাজ করতে তারা ছাড়ে না, যেমনটা করেছে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ স্থাপনা আর বাড়িঘর জ্বালিয়ে। এবং তা করা হয়েছে কোনো এক বৌদ্ধ যুবকের ফেইসবুকে থাকা কোনো এক ছবির উছিলায়।

পাকিস্তানে বছরের পর বছর ধরে চলছে হত্যা, গুম। সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া চলছে খুব পরিকল্পিতভাবে। জোর করে মুসলমান বানানো খুব সাধারণ ঘটনা সেখানে। বিশ্বের আর সব মুসলিম জনপদে যেসব উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আছে তাদের কাছে পাকিস্তানই মডেল, যদিও রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান অনেক আগেই একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে।

একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে, কেউ কোথাও একটি অন্যায় কাজ করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় নিজ দেশে বুক চাপড়ে, সম্পদ ধ্বংস করে, নিজের লোকদের ওপর বোমা হামলা করে কি ধর্ম রক্ষা হয়? লিবিয়ায় শুধু মার্কিন রাষ্ট্রদূতই মারা যায়নি, মারা গেছে নিজেদের মানুষও। আর বহু স্থাপনা, গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানে ২৪ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেলো 'ইনোসেন্স অব মুসলিমস' চলচ্চিত্রবিরোধী বিক্ষোভে।

আমরা কি পারি না এমন কর্মসূচির কথা ভাবতে যা রক্তক্ষয়ী নয়, যা আমাদের

www.pathagar.com

মানুষ ও সম্পদকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় না? সব মুসলিম দেশ মিলে জাতিসংঘে প্রতিবাদ পাঠাতে পারতো এই ছবির প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে। মুসলিম দেশগুলো তাদের দেশে মার্কিন ও ফরাসি রাষ্ট্রদূতদের ডেকে প্রতিবাদ জানাতে পারতো। আর সবচেয়ে কার্যকর যে কাজটি হতো তা হলো মানুষকে সজাগ করা। নানা দেশ থেকে নেয়া একটি মুসলিম বোদ্ধা প্রতিনিধি দল এসব দেশে গিয়ে সেসব দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করতে পারতো।

আমরা বলছি ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু আমরা অনেক সময় নিজেরাই অশান্তি সৃষ্টি করি। হজরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সবচেয়ে বড় শান্তির দূত। কোনো ঘটনায় এমন ধংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখালে বুঝতে হবে আসলে যারা আমাদের প্রগতি চায় না, উন্নতি চায় না, শান্তি চায় না আমরা তাদের ফাঁদে পা দিয়েছি।

অক্টোবর ৪, ২০১২

www.pathagar.com

মহানগর হাকিমের একটি যথার্থ আদেশ

একটি আদেশ দিয়েছেন মহানগর আদালত। এবং অবশ্যই যথার্থ আদেশ এটি। ফেনসিডিলসহ ভোলার সিনিয়র সহকারী জজকে আটকের পর কেন মিডিয়ার সামনে হাজির করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে– এই অভিযোগে রমনার ডিসিসহ পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তাকে তাদের কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহারেরও নির্দেশ দেন মহানগর হাকিম এম এ সালাম।

ঘটনাটি একটু জানা দরকার। ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় সন্দেহভাজন হিসেবে গাড়ি তল্লাশি করে গত পহেলা ডিসেম্বর ৩৪২ বোতল ফেনসিডিল পায় পুলিশ সার্জেন্ট মিজান। আর গাড়ি চালাচ্ছিলেন ভোলার সিনিয়র সহকারী জজ জাভেদ ইমাম। একজন বিচারক বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলসহ ধরা পড়েছে এমন খবর পেয়ে নিউমার্কেট থানায় উপস্থিত হন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংবাদকর্মীরা। তখন তাৎক্ষণিকভাবে ফেনসিডিল বহন ও ঢাকায় তা কার কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা দেন সিনিয়র সহকারী জজ জাভেদ ইমাম।

এমন একটি ঘটনায় সমাজের আর সব স্তরের মতো বিচার বিভাগকেও নাড়া দেয়। জজ জাবেদ ইমামকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এবং পরে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে বলে আদালতে দাবি করেন তার আইনজীবী। এ বিষয়ে রমনার ডিসি, নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তাকে ডেকে আনেণ আদালত। সকালে আদালতে হাজির হন পুলিশের রমনা জোনের ডিসি নুরুল ইসলাম, নিউ মার্কেট থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস আই শফিকুল ইসলাম, জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী নুর হোসেন ও মামলার লিপিবদ্ধকারী শাফিয়ার রহমান। কোন আইনের বলে আসামিকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয়েছে তা জানতে চান আদালত। তাদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় পাঁচজনকেই তাদের কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার ও সাত দিনের মধ্যে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন আদালত।

ব্যাখ্য দিতে আসা পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তা আসামি না হওয়ায় তাদের কোনো আইনজীবী গ্রহণ করেনি আদালত।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি রায় যথার্থ। কিন্তু এমন ঘটনা কি এই প্রথম? পুলিশ বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অনেককেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গ্রেফতার করে গণমাধ্যমের সামনে হাজির করে। এমনকি তাদের বুকে, পিঠে নেমপ্লেট লাগিয়ে দেয়া হয়। এসব নেমপ্লেটে লেখা থাকে সন্ত্রাসী, খুনি, চোর, ডাকাত, ধর্ষণকারী, পাচারকারী ইত্যাদি নানা উপাধি। অথচ মিডিয়ার সামনে যখন উপস্থিত করা হচ্ছে, তখন পর্যন্ত এরা কোনো আদালতে দোষী প্রমাণিত হয়নি। গণমাধ্যমের সামনে এরা দোষ স্বীকার করে বক্তব্য দিচ্ছে, আর গণমাধ্যম কর্মীরাও ফলাও করে তা প্রচার করছে। এরা যা কিছু অপরাধ স্বীকার করে, বেশির ভাগ সময় তা করে ভয়ে। আমরা কজনই বা খবর রাখি পরে আদালতে এদের কজনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে? আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এমন কর্মকাণ্ড।

আজ আদালত রায় দিয়েছে একজন জজ বলেই হয়তো। কিন্তু এ কাজ তো বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। হয়তো আদালত বা কোনো বিচারক তা খেয়াল করেননি। এমন একটি রায়ের পর আশা করি অন্য সবার বেলায়ও পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এমন আচরণ থেকে বিরত থাকবেন। যে কোনো মানুষ কোনো অপরাধের অভিযোগে আটক হওয়ামাত্র তিনি দোষী হয়ে যান না। তার অপরাধ আদালতে প্রমাণ হতে হয়। কিন্তু আদালত পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা হয় না। তার আগেই মিডিয়া ট্রায়াল।

আমরা সাংবাদিকরাও পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যা বলছে, তার ভিত্তিতে প্রচার করে দিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রেই কোনো যাচাই না করে। এমনকি তার ছবিও ছেপে দিচ্ছি বা দেখিয়ে দিচ্ছি। আসলে কোনো একক সূত্রের ভিত্তিতে খবর সাধারণভাবে কাম্য নয়। যদি খবরটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, যদি এই সূত্র ছাড়া আর কোথাও তথ্য পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে একক সূত্রের খবর প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যে খবর তথ্যানুসন্ধান করে বের করা সম্ভব সেই খবর শুধু পুলিশ, র‍্যাব বলেছে, বা দেখিয়েছে, এই ভিত্তিতে করা ন্যায্য নয়।

মহানগর হাকিমের এই আদেশ আমাদের পুলিশ এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য যেমন একটি নির্দেশনা, তেমনি সাংবাদিকদের জন্যও একটি শিক্ষা। আমরা সবাই আগামীতে সচেতন থাকবো সেই আশা করতে পারি।

www.pathagar.com

হলে গিয়ে ছবি দেখার দিন কি আসবে?

বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সে জেমস বন্ড সিরিজের এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ছবি 'স্কাই ফল'-এর প্রিমিয়ার দেখা হলো গত বৃহস্পতিবার। এই প্রিমিয়ার শো-তে হাজির হয়েছিলেন এমন অনেক লোক, যারা হলে গিয়ে ছবি দেখতে চান। কিন্তু হলগুলোর পরিবেশ আর আমাদের চলচ্চিত্রের মান এমন যে, তারা আর সাহস করেন না।

আমাদের চলচ্চিত্রের কেন আজ এমন অবস্থা, তা বিশ্লেষণ করবেন এ খাতের বোদ্ধারা। কিন্তু খুব সাদা চোখে যা দেখি তা হলো এই শিল্পটি ধারাবাহিক অবহেলার শিকার। এমন একটি নান্দনিক শিল্পকে বাঁচাতে যে রাষ্ট্রীয় সমর্থন থাকতে হয়, তা দেয়া হয় না বহুদিন ধরে। আর আছে এই শিল্পটি যাদের দখলে, তাদের দীর্ঘ সময়ের সুস্থ চলচ্চিত্রবিরোধী কর্মকা ।

দেশব্যাপী হলের সংখ্যা কমছে আশঙ্কজনক হারে। খোদ রাজধানীর বুকে, ফার্মগেটের মতো ব্যস্ত এলাকায় দেখা যায় আনন্দ আর ছন্দ সিনেমা হল কিনে নিয়েছে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ নামের একটি কোম্পানি।

একটি সময় নাগরিক মধ্যবিত্তের অন্যতম বিনোদন ছিল হলে গিয়ে ছবি দেখা। হাতে একটি চিপসের প্যাকেট আর কোক, এই নিয়ে কত সময় আনন্দে পার করেছে অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করা নাগরিক সমাজ। কিন্তু সময় পাল্টেছে। মানুষের আয় বেড়েছে, কিন্তু সেই মানুষ আর সিনেমা হলে যায় না। এর কারণ শুধু এই নয় যে, বাড়িতে বাড়িতে টিভি সেটে বসে ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখা কিংবা কম্পিউটারে বসে ইন্টারনেট সারফিং করেই তার সময় কাটে। আসলে সিনেমা হল তাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্স এখন আরো আধুনিক, আরো সজ্জিত। কিন্তু একটি সিনেপ্লেক্স কি পারে এতো মানুষের সাধ মেটাতে? আর এখানে প্রধানত প্রদর্শিত হয় বিদেশি ছবি। দেশি কিছু ছবিও এখানে দেখানো হয়েছে।

নাগরিক মন চায় সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, ভালো মানের বাংলা ছবি দেখতে। কিন্তু সে ধরনের ছবি হয় খুব কম। এই ভালো মান বলতে সব কিছু– তার কাহিনী, তার

www.pathagar.com

পরিচালনা, সম্পাদনা সবকিছু। বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্স একা যথেষ্ট নয় দর্শক টানতে। দরকার দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য হলকে সুন্দর করে তোলা। পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

আর তা করতে হলে দরকার বিনিয়োগ। এই হলগুলোর সংস্কার দরকার। দরকার নিশ্চয়তা পাওয়া যে, ছবি চলবে, তার বিনিয়োগ উঠে আসবে। তা নিশ্চিত করতে হলে ছবির মানও বাড়াতে হবে। আমাদের চলচ্চিত্র দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটি চক্রের হাতে বন্দি, যারা চায় না এখানে শিক্ষিত পরিচালক, প্রযোজক, শিল্পীরা আসুক। এই দুষ্টচক্র এমনই শক্তিশালী যে, কেউ একটি ছবি বাইরে থেকে তৈরি করলে, সে ছবি মুক্তি দিতেও সেই পরিচালককে তাদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে। অথচ দেশের অর্থনীতি চলছে বাজার অর্থনীতির নিয়মে। যদি বাজার অর্থনীতিই নিয়ম হয়, তাহলে ছবি সেন্সর হয়ে যাওয়ার পর কি তথাকথিত প্রযোজক/পরিচালক/প্রদর্শক সমিতি একটি ছবির মুক্তি আটকে দিতে পারে? কিন্তু তা হচ্ছে।

মানুষ আসলে ভালো ছবি দেখার সুযোগই পাচ্ছে না। সেই সুযোগ করে দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। মানুষ সিনেপ্লেক্সে ছবি দেখে আনন্দ পায়, কিন্তু তারা চায় ফিরে আসুক সেই পুরোনো দিন, সাধারণ হলে গিয়ে ছবি দেখার দিন।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র চায় ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতায়ন, গণমাধ্যম তা নিশ্চিত করে

১৯৭১ এ পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার সময়, শুধু একটি আলাদা ভূখণ্ড পাবো, এমন স্বপ্নই ছিলো না আমাদের। এ দেশের মানুষের চাওয়া ছিলো তারা পাবে সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সবার জন্য এক উদার, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি এখন যে দুর্নীতি নিয়ে এতো কথা, তাও আসলে কোনো না কোনোভাবে গণতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

একটি সক্রিয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পারে সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করে জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। 'Government of the people, for the people and by the people', আব্রাহাম লিংকনের এই বিখ্যাত উক্তির চেয়েও গণতন্ত্র আমাদের মানুষের কাছে আরো বেশি কিছু। এ দেশের মানুষের কাছে গণতন্ত্র মানে এক উন্নত আর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন।

আর এই যে মানুষের স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ দেশের মানুষের নিরন্তর সংগ্রামে তাদের সাথী গণমাধ্যম। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ দেশের গণমাধ্যম মানুষের মনে একটা বড় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। হয়তো পশ্চিমা দেশের মতো স্বাধীনতা নেই, কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যমের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তা সরাসরি গণতন্ত্রের ফসল। নব্বইয়ের গণ আন্দোলনে এ দেশের আপামর মানুষের সাথে গণমাধ্যম কর্মীরাও ছিলেন রাজপথে। সমাজে যা কিছু ঘটছে, সে নিয়ে মানুষকে সচেতন রাখতে ভূমিকা রাখছে গণমাধ্যম কর্মীরা। একমাত্র না হলেও, আজ বাংলাদেশে মানুষের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসের জায়গা গণমাধ্যম।

তবে এই পথটুকু কখনোই খুব সহজ ছিলো না। এখনো নেই। অনেক চাপ, অনেক বন্ধুর পথ সবসময়ই পাড়ি দিতে হয়েছে, এখনো দিতে হচ্ছে আমাদের গণমাধ্যমকে। কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা ছিলো, এখনো আছে, নির্যাতন আছে, এমনকি হত্যার ঘটনাও আছে। শুধু সরকার নয়, এই চাপ আর হুমকি আসে বিরোধী দল থেকেও, আসে আর সব গোষ্ঠী থেকেও। তবে এত সব বাধার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা সমাজে সক্রিয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, যারা গণমাধ্যমের বিরোধিতাই শুধু করে না, তারা আসলে সমাজের প্রগতিরই শত্রু।

www.pathagar.com

এই আধুনিক যুগে এসে গণমাধ্যম আর শুধু পত্রিকা বা সাপ্তাহিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রাইভেট টেলিভিশন অনেক আগেই একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে। এফএম রেডিও অনেক বড় বাস্তবতা। কিন্তু তার চেয়ে বড় বাস্তবতা হয়ে উঠছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত অনলাইন মিডিয়া। আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যম অত্যন্ত সক্রিয়, সাবলীল।

প্রতিটি মানুষের জীবনধারণের জন্য যেমন দরকার খাদ্য, কাপড় ও বাসস্থান, তেমনি যোগাযোগও একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ তার জীবনে। একুশ শতকের মানুষ চায় প্রতি মুহূর্তে তার কাছে সর্বশেষ তথ্যটি থাকুক। এই চাওয়াই পূরণ করে গণমাধ্যম। কিন্তু গণমাধ্যমের ভূমিকা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নেই। সরকার পরিচালনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিনোদনে, সামাজিক যে কোনো প্রয়োজনে গণমাধ্যম আজ হয়ে উঠছে অপরিহার্য।

একটি সক্রিয়, কার্যকর গণমাধ্যম থাকার অর্থ মানুষ অজ্ঞ নয়, সে জানে এবং এই জানার কারণে সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে সে। গণমাধ্যম তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার অর্থ হলো, তাদের কাছে দেয়া জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করছেন কিনা, সে বিষয়ে জনগণকে সচেতন রাখা। গণমাধ্যম নিজে সজাগ থাকার অর্থ হলো, আমলাতন্ত্র জনগণের সেবক হিসেবেই কাজ করবে, তাদের দুর্নীতি কমবে।

গণতন্ত্র চায় ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতায়ন। গণমাধ্যম তা নিশ্চিত করে যোগাযোগ আর স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের মাধ্যমে। তাই গণতন্ত্র আর গণমাধ্যম, আমাদের জীবনের দুটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

গণতান্ত্রিক সমাজ মানুষকে দেয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এর অর্থ হলো স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, স্বাধীনভাবে বলা, স্বাধীনভাবে লেখা, অন্যের সাথে স্বাধীনভাবে আলোচনা করা, স্বাধীনভাবে বিশ্লষণ করা, স্বাধীনভাবে সমালোচনা করা এবং স্বাধীনভাবে বিরোধিতা করা। গণমাধ্যম মানুষের এই স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে।

সাধারণভাবে মানুষের মত প্রকাশের একটি বড় প্লাটফর্ম গণমাধ্যম। বাংলাদেশে যেন তার চেয়ে বেশি। আমাদের জাতীয় সংসদ বিরোধী দলের লাগাতার বর্জনের কারণে হতে পারেনি সব বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদে বিরোধী দল না থাকায় এখন গণমাধ্যমই হয়ে উঠছে মানুষের কাছে অন্যতম বড় বিকল্প। আর এই বিকল্প হয়ে উঠার জন্য গণমাধ্যমকে হতে হবে অনেক বেশি দায়িত্বশীল। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর তথ্যসমৃদ্ধ মতামত মানুষকে সাহায্য করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। গণমাধ্যমের বড় কাজ তার পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

www.pathagar.com

সত্যিকার গণতন্ত্র চায় নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ আর সরকারের ক্ষমতা কমিয়ে আনতে। মানুষ যেন জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে বৈষম্যের শিকার না হয়, তার প্রাপ্যটুকু বঞ্চিত না হয়। গণমাধ্যম এখানে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে। সমাজে নীতি-নৈতিকতা, ন্যায্যতা নিশ্চিত করার অনেক বড় দায়িত্ব গণমাধ্যমের উপর।

অনেকেই বলেন এ দেশের গণমাধ্যম ইতিবাচক নয় কেন? কেন তারা মানুষের সাফল্য দেখে না, কেন তারা শুধু পত্রিকার পাতাজুড়ে কিংবা টিভির পর্দাজুড়ে নেতিবাচক খবরে পূর্ণ করে রাখে? আমাদের তো অনেক সাফল্য আছে। কথাটা অনেকংশেই সত্য। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে গণমাধ্যম শুধু খারাপ খবরই দেবে না, নিশ্চয়ই ভালো খবর, সাফল্যের খবরও প্রচার করবে। কোনো বিষয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

আরেকটি সংশয়ের জায়গা হলো অর্থের কাছে গণমাধ্যমের সমর্পণ। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমকে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধ্য করছে। তবে তা শুধু গণমাধ্যমের বেলায় প্রযোজ্য নয়। রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা সবখানে যখন অর্থ প্রভাব বিস্তার করছে, তখন গণমাধ্যম কি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে বাস করতে পারে? তাই গণমাধ্যমকে একা দোষারোপ করা যায় না যে, সে অর্থ দ্বারা প্রভাবিত। অনেক সীমাবদ্ধতার পরও এ দেশের গণমাধ্যম নাগরিক সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এ দেশে যেটুকু গণতন্ত্র এখনো অবশিষ্ট আছে, তা আছে গণমাধ্যমের জন্যই।

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা, কিছু অন্য প্রসঙ্গ

'A RESPONSIBLE press is an undoubtedly desirable goal; but press responsibility is not mandated by the constitution, and like many other virtues, it cannot be legislated,' Chief Justice Warren Burger of the US Supreme Court ruled on behalf of a unanimous court in June 1974.

যারা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার কথা বলেন তারা এই উক্তিটি নিয়ে ভাবতে পারেন। তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায় বেশি করে উঠে আসছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা। বিশেষ করে ব্যক্তিমালিকানাধীন চ্যানেলগুলোর সংবাদ আর অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ে যে কোনো আলোচনায় যে নামটি প্রথমে আসবে তার নাম একুশে টেলিভিশন। ২০০০ সালে একুশের মাধ্যমেই এ দেশের মানুষ সম্প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত সত্যিকার সংবাদ পেতে শুরু করে। এর আগে বিটিভি সংবাদ থাকলেও তা ছিল কেবলই সরকারি সংবাদ এবং পুরোটাই ছিলো সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের মুখস্থর মতো করে পড়ে যাওয়া। একুশে টিভিই প্রথম পেশাদারিত্বের সাথে সংবাদ উপস্থাপন করে। এক যুগ পরে দেশে এখন প্রায় দু ডজন টেলিভিশন চ্যানেল।

গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। গণমাধ্যম পথ চলে গণমানুষের সাথে। গত ৪১ বছরে বাংলাদেশের গণমাধ্যম অনেক সংগ্রামের সাথে তার স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছে। মার্কিনিদের মতো গণমাধ্যম নির্বাচনে প্রভাব না ফেললেও, বাংলাদেশের গণমাধ্যমও ভূমিকা রাখছে জনমত গঠনে।

দেশের রাজনীতিতে টেলিভিশনের প্রভাব কতটুকু, এ নিয়ে বাংলাদেশে কোনো গবেষণা হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে আজকের দিনে এ দেশের বহু মানুষের মনে টেলিভিশনে প্রচারিত ছবি আর কথা সামাজিক অভিমত তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখছে। টেলিভিশন তার দর্শক-শ্রোতার জন্য একটা দর্শন তৈরি করে বিধায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ধারণা তৈরিতে প্রভাব রাখে। আজ টিভির কারণে সংবাদ আর মতামত শুধু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নয়, এই শ্রেণীবিভেদ ভেঙে দিয়েছে চ্যানেলগুলো। মানুষকে নাগরিক করে তুলতে, তার ভেতর ভোগের চাহিদা তৈরিতে বাজারের শক্তিকেও আঘাত করেছে এসব চ্যানেল। টেলিভিশনে প্রচারিত

www.pathagar.com

খবর আর টক-শো এখন বহু আড্ডার আলোচনার বিষয়।

শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় ব্যক্তিখাতে বাংলাদেশে টেলিভিশনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো, তার বিকাশ হয়েছে খুবই দ্রুত। আসলে অর্থনীতি বাজারমুখী হওয়ার পর ব্যক্তিখাতে টেলিভিশনের সামনে এ ছাড়া আর পথ ছিল না। গত ১২ বছরে প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর অবস্থান এতটাই শক্তিশালী যে, এখন সরকারনিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আর কোনো আলোচনায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠান কিংবা সংবাদ উভয় ক্ষেত্রেই বিটিভি আর নেই কোনো তালিকায়, যা এক যুগ আগেও ছিলো একটিমাত্র মাধ্যম।

বিনোদন, খেলাধুলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক থাকলেও বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলোয় সংবাদই প্রধান উপকরণ। চারটি বিশেষায়িত সংবাদ চ্যানেল থাকলেও বিনোদন চ্যানেলগুলোও খবর আর খবরভিত্তিক অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আর খবরের জন্য মানুষের একমাত্র চাওয়া প্রাইভেট চ্যানেল। যার সামান্য সুযোগ আছে, সেও চায় বিটিভি ছেড়ে ক্যাবল টিভি দেখতে।

সংবাদের চাহিদা তৈরিও করছে প্রাইভেট চ্যানেলগুলো। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আসছে একটির পর একটি চ্যানেল। যেখানে ঘটনা, সেখানেই তাদের ছুটে চলা, সরাসরি সংবাদ ও ঘটনা প্রচারের প্রতিযোগিতা, মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখছে সংবাদে। এবং এ অবস্থা শুধু শহরে নয়, গ্রামের মানুষও এখন অনেকটা সময় ব্যয় করে সংবাদ আর সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠানে।

সংবাদ আর সমসাময়িক ঘটনা সার্বিকভাবেই এতো বেশি হওয়ার কারণ আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও। এখানে রাজনীতি এতটাই সংঘাতময় যে, মানুষ সারাক্ষণ খবর রাখতে চায় কখন হরতাল আসছে, কখন অবরোধ আসছে, কোন নেতা-নেত্রী কী বলছেন? বিশেষ করে শহর অঞ্চলের মানুষকে বলা যায় high-news consumers।

শুধু রাজনীতি নয়, অপরাধ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিক্ষা, কৃষি সব ধরনের খবরেরই চাহিদা আছে। ভারতীয় চ্যানেলগুলোর বিশাল বাজেটের অনুষ্ঠানমালার সাথে আমাদের চ্যানেলগুলো বিনোদনমূলক চ্যানেলগুলোকে তুমুল প্রতিযোগিতা করতে হলেও সংবাদে তা নেই।

সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে চ্যানেলগুলো বিশেষ দৃষ্টি দেয় সেগুলো হলো:

তাদের খবর বিশ্বাসযোগ্য
নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ
তারাই প্রথম এই খবর প্রচার করেছে। (ব্রেকিং নিউজের বেলায়)
সংবাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ (বিশেষ করে টক-শোতে)

www.pathagar.com

সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু চ্যানেল, বিশেষ করে দু-একটি সংবাদভিত্তিক চ্যানেল আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি চলে গেছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জও রয়েছে তাদের জন্য।

সংবাদ এখনো অনেকখানি সমাজের সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা মানুষের খোরাক। ক্যাবল টিভি বা স্যাটেলাইট টিভি দেখার সুযোগ এখনো অনেক সীমিত। টেরিস্ট্রিয়াল সুবিধা থাকায় সরকারনিয়ন্ত্রিত বিটিভি এখনো অনেক মানুষের ঘরে ঘরে। দরিদ্র মানুষের টিভি জগতে প্রবেশাধিকার এখনো অনেক বড় স্বপ্ন।

প্রাইভেট বা স্বাধীন টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা অনেক। অনেক ক্ষেত্রেই তারা স্বাধীনভাবে সংবাদ ও মতামত প্রচার করছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সরকার, বিরোধীদল বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ নেই সে কথা বলা যাবে না। বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপ অস্বাভাবিকভাবে বেশি। সবচেয়ে বেশি চাপ গণমাধ্যমের মালিকদের নিজেদের গোষ্ঠীগত আর ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের চাপ। আছে সরকারি ও বিরোধীদলের চাপ, আছে সাংবাদিকদের ভেতরকার রাজনৈতিক আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম লেখাটি। গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা। প্রথম ভাবনা, সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী? গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যম নাগরিকের অধিকার রক্ষা করতে ভূমিকা রাখে, তথ্যজগতে তার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। মানুষ জানতে চায়, মানুষ সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায়। আর সেখানেই গণমাধ্যমের ভূমিকা। নীতিনির্ধারক, আইনসভাসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সাথে মানুষের যোগাযোগ ঘটাতে ভূমিকা রাখে গণমাধ্যম। বাংলাদেশে গণমাধ্যম নানা ঐতিহাসিক ঘটনায়, মানুষের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থেকেছে। দুর্নীতি, সহিংসতার ইস্যুকে অনেক সময় গণমাধ্যমই সবার আগে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে।

অনেক সময়ই বলা হয়, বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে। এ কথা বেশি বলে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, নানা ধরনের বাধা উপেক্ষা করেই কাজ করতে হয় সাংবাদিকদের। মামলা আছে, হুমকি আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যা আছে, তা হলো মালিকদের বাধা। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের মালিকানার ধরন অনেক বেশি প্রশ্নসাপেক্ষ, অনেক বেশি গণমাধ্যমের মূল চেতনার পরিপন্থী। মালিকদের ব্যবসায়িক আর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক দুর্নীতি, অনেক বড় বড় ব্যবসায়িক অনিয়ম, দুর্বৃত্তায়নের খবর প্রচার করতে পারে না গণমাধ্যম। আর সাংবাদিকদের রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে এই সুযোগটা রাজনৈতিক শক্তি আর দুর্বৃত্তরা বেশি করে পাচ্ছে। ফলে আজ যখন কোনো

www.pathagar.com

সাংবাদিক হয়রানি, হুমকি বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তখন তারা জন্য সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হয় না। প্রশ্ন আসে, যদি স্বাধীনতাই না থাকলো, তাহলে এতো এতো চ্যানেল, রেডিও, পত্রিকা, সাময়িকী, অনলাইন নিউজ সাইট হচ্ছে কেন? হচ্ছে, কারণ মিডিয়া যে কারো কারো জন্য এক ধরনের অস্ত্রও বটে।

এই স্বাধীনতা কি কখনো কখনো অতি স্বাধীনতায় বা দায়িত্বহীনতায় পরিণত হয়? হয় বৈকি, যদি সেই সংবাদ প্রতিষ্ঠানে একটি লিখিত আচরণবিধি না থাকে, যদি সাংবাদিকরা সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত না হয়। তবে এই ভয়ে সাংবাদিকতা বন্ধ করে দেয়া যায় না। কোনোভাবেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। এই স্বাধীনতা খর্ব হয়, এমন কিছু করা যাবে না। সেন্সরশিপ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থী, এমনকি তা আমাদের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গণমাধ্যম নিয়ে প্রশ্ন থাকলে তার সমাধান করবেন গণমাধ্যম কর্মীরাই, নিজেরাই নিজেদের আচরণবিধি করবেন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রথম সমস্যা তার রাজনীতিকীকরণ। যেভাবে রাজনীতি ঢুকেছে এই পেশায়, এতে বস্তুনিষ্ঠতা নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক সংবাদ প্রতিষ্ঠানেরই এখন দর্শক-শ্রোতার কাছে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা নেই, নেই বিশ্বাসযোগ্যতা। আর গণমাধ্যমের মালিকানার ধরনও একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এর স্বাধীনতার জন্য। তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে কমে গেছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, বেড়েছে চাঞ্চল্য করার প্রবণতা। রাজনীতি এতোটাই প্রভাব বিস্তার করে যে অনেক বড় ঘটনাও কোনো পত্রিকা বা টেলিভিশনে আসে না। ২০০১-এর নির্বাচনের পর সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ হয়, তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়, নারীদের পাইকারি হারে ধর্ষণ করা হয়, তা কখনোই কোনো কাগজে বা টেলিভিশনে প্রকাশ বা প্রচার হয়নি। আসলে তখনকার সরকার, তখনকার রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপে তা প্রকাশ বা প্রচার করতে দেয়া হয়নি। এবং এমন একটি সেন্সরশিপের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে কোনো প্রতিবাদও করা হয়নি।

গণমাধ্যম কর্মীদের এই রাজনৈতিক বিভাজন একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বিভক্তির ফলে সরকারি বা বেসরকারি, কিংবা গোষ্ঠীগত চাপ, কিংবা হুমকি, কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ভূমিকা নিতে পারছে না সাংবাদিকরা।

আসলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য দরকার নিজের ভূমিকার প্রতি গণমাধ্যম কর্মীদের আস্থা রাখা, দলীয় কর্মীর মতো আচরণ না করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, এমনকি সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোর উচিত একটা নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করে সে পথে চলা।

www.pathagar.com

সকলের দক্ষতা আর স্বচ্ছতা নিয়ে কটাক্ষ করে, সমালোচনা করে গণমাধ্যম। কিন্তু আজ বাংলাদেশের কয়টি সংবাদপত্র বা টেলিভিশন, সংবাদ সংস্থা কিংবা বেতার দাবি করতে পারে যে, পুরো মাত্রায় স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে তারা? কয়টি হয়ে উঠেছে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান? কয়টি প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো বেতন-ভাতা দেয় সাংবাদিকদের? কয়টি প্রতিষ্ঠান পেরেছে নিজেদের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে? কয়টি প্রতিষ্ঠানের আছে তথ্য ও গবেষণা বিভাগ? এসব বিষয়ে গণমাধ্যমের রয়েছে সীমাহীন ব্যর্থতা।

আর এসব কারণেই কথা উঠছে গণমাধ্যমর কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের। কিন্তু তা সরকার বা কোনো গোষ্ঠী নয়, এই পর্যবেক্ষণের কাজটি করবে গণমাধ্যম নিজেই। সাথে রাখতে পারে সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের। আচরণবিধি মেনে, নীতি-নৈতিকতার পথে চলে গণমাধ্যম আগামী দিনে হয়ে উঠবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন

অষ্টম ওয়েজ বোর্ডের মহার্ঘ্যভাতা বা ডিএ বেশ কয়েক মাস আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। এখন তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান এর মধ্যেই ওয়েজ বোর্ডের ডিএ পুরো বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। পুরো রোয়েদাদ দিতে আরো কিছুদিন লাগবে।

যদি ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা হয় সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের বেতন-কাঠামো বর্তমান বাজারে অনেক প্রতিযোগিতামূলক হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়টি সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা তা বাস্তবায়ন করে? গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান ওয়েজ বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাদি ঠিকমতো বাস্তবায়ন করে। দু-একটি সংবাদপত্র বা সংস্থা আছে, যারা কিছু কিছু অংশ বাস্তবায়ন করে, সবটুকু দেয় না। আর বড় একটি অংশ না দেয়ার দলে। তাদের একটি অংশ অবশ্য বেতনই দেয় না।

যারা ওয়েজ বোর্ডের তোয়াক্কা করে না তাদের সংখ্যাই বেশি। যারা ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করছে না তাদের মধ্যে আছে এমন সব সংবাদপত্র যেখানে কাজ করছেন সাংবাদিক ইউনিয়নের (উভয় পক্ষ) অনেক বড় বড় নেতাও। অথচ এই ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ দেশের আইন, যা সংবাদপত্রের মালিকরা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। তারা তা না করে থাকতে পারছে আমাদের সাংবাদিকদের দুর্বলতার কারণে, সরকারের নজরদারির অভাবে। কোনো কোনো ইউনিয়ন নেতা তো নিজেরাই কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে নেই। কোনো কোনো সম্পাদক নিজের প্রতিষ্ঠানে এটি বাস্তবায়ন না করেও টেলিভিশন টক-শোতে গিয়ে সরকার আর বিরোধী দলকে নানা ধরনের নৈতিক উপদেশ দিচ্ছেন।

আলোচনা অবশ্য তা নয়। সংবাদপত্র দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে এই ওয়েজ বোর্ড আদায় করতে সক্ষম হলেও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তার কিছুই নেই।

কী থাকে এই ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদে? থাকে পদ ও গ্রেড অনুযায়ী বেতন কাঠামো, ইনক্রিমেন্টের ধাপসমূহ, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মূল বেতনের দ্বিগুণ গ্র্যাচুইটি, গ্রস বেতনসহ বিনোদন ছুটি, মেডিক্যাল ভাতা, পোশাক ভাতা, কোনো কোনো

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ঝুঁকি ভাতাসহ নানা ধরনের সুবিধা; কাউকে চাকরিচ্যুত করতে হলে বা কেউ চাকরি ছেড়ে দিলে কী কী সুবিধা পাবেন, তার নির্দেশনা ইত্যাদি। পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের আয়কর সম্পূর্ণ বহন করে প্রতিষ্ঠান। বছর শেষে আয়কর পরিশোধের চালান পেয়ে যান তারা। কিন্তু টেলিভিশনে তা নয়। কোথাও কোথাও পুরো দায়ভার বহন করতে হয় সাংবাদিক আর কর্মীদের। কোথাও বা এই আয়করের অর্ধেক বহন করে প্রতিষ্ঠান।

এসব বিধান রাখা হয় সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের কাজের ধরন, ঝুঁকি আর এই পেশার অনিশ্চয়তা মাথায় রেখে।

একুশে টেলিভিশন যখন শুরু হয়, তখন নতুন এই মাধ্যমে কাজ করার আগ্রহের সাথে সাংবাদিকদের বিবেচনায় ছিল এখানকার বেতন কাঠামো। বেতন তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় অনেকেই এখানে আসতে শুরু করে। একটা পর্যায়ে এসে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করার ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয় সাংবাদিকদের ভেতর।

আজ প্রায় দুই ডজন চ্যানেল। অর্ধ ডজন এফএম রেডিও। শত শত সাংবাদিক, সংবাদকর্মী। এফএম রেডিওর ভেতরকার অবস্থা অনেকটাই অজানা। কিন্তু চ্যানেলগুলোর খবর কিছুটা জানা যায়। সাংবাদিকরা, এখানকার কারিগরি বিভাগের মানুষেরা, দ্রুততার সাথে চ্যানেল বদলাচ্ছেন, বেতন বাড়িয়ে নিচ্ছেন।

কিন্তু স্বস্তি নেই। একের পর এক চ্যানেল আসছে, প্রযুক্তিনির্ভর পথচলা বেড়েছে। লাইভ কাভারেজ অনেক বেড়েছে। সাংবাদিকদের পরিশ্রম বেড়েছে। কিন্তু নিশ্চয়তা কমেছে। বেতন আপাতত বেশি মনে হলেও সংবাদপত্রের ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বিবেচনায় নিলে কমে গেছে এই খাতের বেতন কাঠামো।

সব চ্যানেলেরই বেতন কাঠামো বাজার অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক নয়। দু-একটি চ্যানেলের বেতন কাঠামো খুব কম। এক কথায় বলা যায় দুর্বল। আবার বেতনটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই টেলিভিশন কর্মীদের। নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড (২/১টির থাকতেও পারে)। কোনো বেতন স্কেল নেই। তাই নেই গ্র্যাচুইটি। দু-একটি চ্যানেল ছাড়া পোশাক ভাতা নেই। এই ভাতা হয়তো মালিকদের অতি আদরের উপস্থাপিকারা পেলেও পেতে পারেন। অবশ্যই তা জানা যায় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। বিনোদন ছুটি বলতে কিছু নেই। আর ঝুঁকি এখানকার কর্মীদের বেশি হলেও এদের জন্য নেই এ ধরনের কোনো ভাতার ব্যবস্থা। যা কিছুই হয়, সব এডহক ভিত্তিতে।

আর বহু পত্রিকার মতো এখন কোনো কোনো টিভি চ্যানেলেও শুরু হয়েছে অনিয়মিত বা বিলম্বে বেতন। আর আছে নিগ্রহ। অনেক দৃষ্টান্ত আছে (অবশ্যই সবাই নয়), চাকরি ছেড়ে যেতে হয়েছে শেষ মাসের বেতনটুকু না নিয়েই। অনেক

www.pathagar.com

চ্যানেলের মালিকই যারা চাকরি ছাড়ে তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের হয়রানিমূলক মামলা করেন, যদিও এসব মামলার কোনো সুরাহা হয় না কোনো কালেই। কিন্তু একটা মানসিক যন্ত্রনা তৈরি হয় সেই সব সাংবাদিকের মনে।

টেলিভিশন মালিকদের একটি সংগঠন হয়েছে। তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এখন দরকার সাংবাদিক-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এখানে কাজ করেন এমন অনেকেই উভয় সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য। অনেক ইউনিয়ন নেতাও আছেন টেলিভিশন চ্যানলেগুলোয়।

সময় এসেছে এই খাতের জন্য ভিন্নভাবে চিন্তা করার। সংখ্যায় বেড়েছে চ্যানেল। বেড়েছে সাংবাদিক আর কর্মীর সংখ্যা। এখন প্রয়োজন চ্যানেল সাংবাদিকদের একটি সংগঠন। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে ওয়েজ বোর্ডের মতো একটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব ইলেকট্রনিক মাধ্যমকে।

নিউজপেপারস এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন্স অব সার্ভিসেস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর কল্যাণে মুদ্রণ মাধ্যমে সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের চাকরি টেলিভিশন ও বেতারের সাংবাদিক-কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত। এই মাধ্যমের সাংবাদিকদের চাকরি, চাকরির নানা সুবিধাদি, চাকরির নিশ্চয়তা রক্ষায়, মালিকদের খবরদারি বন্ধে এমন একটি আইনি সুরক্ষা বড় বেশি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা।
জন্ম ১৯৬৫ সালে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। লেখাপড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। সাংবাদিকতা শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই। প্রথমে দৈনিক *বাংলার বাণী*, পরে *বাংলাদেশ অবজারভারে*। কাজ ক্যাম্পাস রিপোর্টিং। পাশাপাশি বিভিন্ন সাপ্তাহিকীতে লেখালেখি। কাজ করেছেন ইংরেজি দৈনিক *দ্য মর্নিং সান* ও *দ্য ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেসে*। একুশে টেলিভিশন চালু হলে মুদ্রণ মাধ্যম ছেড়ে চলে আসেন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। কাজ করেছেন *এটিএন বাংলা*, *আরটিভি* ও *বৈশাখী* টিভিতে। এখন বার্তা পরিচালক, *একাত্তর টেলিভিশন*। সাংবাদিকতা তার অস্থিমজ্জায়। তাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, কিংবা অর্থনৈতিক কারণে চ্যানেল বা পত্রিকা বন্ধ হলে অন্য কোনো চাকরি করেছেন জীবিকার তাগিদে, কিন্তু আবার ফিরেছেন গণমাধ্যমেই। তার দিনরাত্রি কাটে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও সাংবাদিকতার হালচাল নিয়ে আলোচনা করে। এটি তাঁর দ্বিতীয় বই। এর আগে ২০১১-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই *সময়ের ভাবনা*।

www.pathagar.com

KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ

ISBN: 984 70120 03114

9 847012 003114

katha@professorsbd.com; www.professorsbd.com